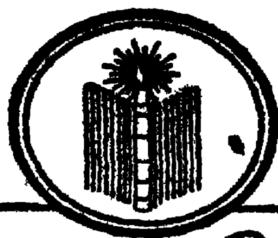
# রাণী বৌ

প্রাণতোষ ঘটক



ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা — ৬

প্রথম প্রকাশ মাঘ—১৩৬৬
মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র

গোপালদাস পাবলিশার্সের পক্ষে শ্রীআশিসগোপাল মজুমদার কর্তৃক ২৮।৩ ঘোষ লেন হইতে
প্রকাশিত, ও ৪নং সিমলা ষ্ট্রীটস্থ শৈলেন প্রেস হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্তৃক মুদ্রিত।

॥ উৎসর্গ ॥

সতীর্থ ও সাহিত্যসঙ্গী
রমাপদ চৌধুরী
বন্ধুবরেষু

গৈরিক-বর্ণ জলের, লাখো লাখো সর্পফণার মত তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস। বিদ্যুতের মত যেমন ক্ষিপ্র বেগ তেমনি মেঘনাদের মত তর্জন-গর্জন। দিকভোলা একটা একটা জলের কল্লোল যেদিকে খুশী ছুটে চলেছে উদ্দাম গতিতে। বাবলা আর শিমুল গাছের আনাচে-কানাচে ক্ষেপা হাওয়া থেকে থেকে ডেকে উঠছে। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ, যেন একসঙ্গে অনেক উড়োজাহাজ গর্জে ওঠে আর মেঘের অন্তরালে বিলীন হয়ে যায় হঠাৎ আবার। মধ্যদিন, তবুও আঁধারের কালিমা আকাশে। কাজলকালো জমাট মেঘ, ধীরে ধীরে গ্রাস করে মহা-শূন্যকে। কড় কড় কড় কড়—বাজ প'ড়লো আকাশের অগ্নিকোণ থেকে। সোনালী আগুন, সাপের আকারে ঝিলিক তুললো বজ্রপাতের খানিক আগে। তারপর আকাশফাটা ডাক ঘন ঘন। চকিতের মধ্যে পাশাপাশি দুটো নারকেলগাছের শিখর, ডালপালা-সমেত জ্বলতে থাকে সহসা। বৃষ্টিঝরা আকাশে ক্ষণস্থায়ী ধূসর ধোঁয়ার রেখা দেখা দেয়। নারকেলের দগ্ধশাখা ছাইভস্মের মত বাতাসে উড়লো। টেলিগ্রাফ-তারের একটা পোষ্ট জ্বলছে দাউ দাউ। শালকাঠের পোষ্টে বাজের ছোঁয়া লেগেছে মাথায়।

গেরুয়া রঙের সীমাহীন বিস্তার। যতদূর চোখ যায়, শুধু ঘোলা জল আর জল। আকাশের কৃষ্ণরেখা দিগন্তে মিশেছে হয়তো। অনেক

দূর থেকে জলের গর্জন ভেসে আসছে মত্ত হাওয়ায়। সমুদ্র ডাকছে যেন। কারা যেন গুমরে গুমরে উঠছে শোক-উচ্ছ্বাসে।

গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের মোহনা থেকে কালোমেঘের ডিঙা সারি সারি উড়ে আসতে দেখা যায় গত শনিঠাকুরের দিনে। সকালবেলায় এবং সেই শনিরোজের গুমোট-গরম দুপুরেই প্রথম বর্ষায় আকাশ। পুষ্পরেণুর মত ঝির ঝির বৃষ্টি। ইল্‌সেগুঁড়ি।

জামীরা, মাতলা, রায়মঙ্গল, মালঞ্চ, হরিণঘাটা—পাঁচ পাঁচটা নদনদী অতিবৃষ্টির দাপটে ক'দিনেই একাকার হয়ে পড়েছে। আজ হপ্তা শেষ হ'তে চলেছে, তবুও বর্ষণের শেষ নেই যেন! প্রথম প্রথম ছন্দ ছিল না যেন এই বর্ষার কবিতায়। এলোমেলো আর বেসুরো ঠেকেছে কেমন। তাল জ্ঞান নেই, কখনও ধীরে কখনও জোরালো গতি। পর পর তিনটে রাত শেষ হওয়ার পরে একটা বাঁধাধরা ছন্দ ধ'রেছে। এক নাগড়ে জল ঝরছে মেঘলা আকাশ থেকে। বিরামহীন।

উচ্ছল তরঙ্গের আঘাতে মাটির ধ্বস নামছে কোথায় কোথায়। আলের খাটো গড় আর চালাঘরের মাটির দেওয়াল লুটিয়ে পড়ছে জলের বুকে। শোলার ভেলার মত খড়ের চালা ভেসে চলেছে গণ্ডায় গণ্ডায়। চালায় নারী আর শিশুর দল পরিত্রাহি চিৎকার করছে, সাহায্য আর আশ্রয়ের ব্যর্থ আশায়। গাই-বাছুর আর ছাগল স্ফীতকায় জল-কল্লোলে খড়কুটোর মত ভাসছে। পশু আর মানুষের প্রায় একই অবস্থা, এই ঘনঘটার দিনে।

একখানি পানশি, জলের গতির সঙ্গে লড়াই চালাতে চালাতে এগিয়ে আসছে এই দিকপানে। নৌকায় দু'জন মানুষ, হাল

টানছে বুকের জোরে। থেকে থেকে কথা বলছে জোরালো সুরে। জলের ডাকে, বাতাসের গর্জনে একে অন্যের কথা শুনতে পায় না।

—তল্লাসীতে কাজ নাই আর। তাকে খুঁজে মিলবে না। সে নাই।

—এমন কথা বলিস না জোসেফ্। আমাগোর রাণীর কাছে মুখ দেখাবি কোন্ লজ্জায়!

—বাজে কথা বলি নাই। কালীচরণ আর নাই। মাঠের আল সামাল দিতে গিয়ে ভেসে গেছে বানের জলে। আমার কথাটি মিলিয়ে লিও চৌধুরীভাই।

—বুকটা যে দুরদুর করে জোসেফ্! রাণী যদি শুধোয় তো কি বলবো তাকে? দুঃখে চোখ পাকিয়ে কথা বলে চৌধুরী। গলার শিরা ফুলিয়ে।

জবাব দেয় না জোসেফ। সে তখন বেঁকে গেছে ঠিক ধনুকাকারে। তার মাথা আর পা প্রায় এক। তবুও জলের তোড় সামলাতে পারে না। বারে বারে হাল ফসকে যায়। পানশি এগোতে চায় না যেন। জোসেফের শ্বাস রুদ্ধ এখন। ঐ উঁচু ডাঙ্গায় পানশি না ভিড়িয়ে দম ফেলবে না হয়তো।

ঢেঁড়া-পেটার শব্দ ভাসছে দূরে কোথায়। যুদ্ধের সাইরেন বেজে চলেছে যেন ভয় আর আশঙ্কা জাগিয়ে। মানুষের কান্না আর চিৎকারের কোরাস শোনা যায় মাঝে মাঝে। আর্ত হাহাকার। ভীতচকিত পশুর আর্তনাদ।

গোটা দুই উপরি উপরি হাল চালিয়ে পানশি ডাঙায় ভিড়িয়ে দেয় জোসেফ্। উঁচু টিলায় উঠে পড়ে এক লাফে। পানশির মুখ ধরে হিড়হিড়িয়ে টান দেয়। বলে,—চৌধুরীভাই, মিথ্যেই শ্রম করলে এতটা।

—কালীচরণ নাই, বিশ্বেস হয় না জোসেফ।

ঘন ঘন শ্বাস ফেলে জোসেফ। তার হাঁফ ধরা বুক উঠছে নামছে। বৃষ্টির নোনাজল মাথা থেকে মুখে গড়িয়েছে। বার কয়েক থু থু করল জোসেফ। একটা বুকভরা শ্বাস টানার পর কথা বলে সে। বললে,—মরণটাকে মানুষ পেত্যয় করে না।

চৌধুরীর বুকের মাঝখানে একখানি হাসিভরা মুখ বার বার উঁকি দেয়। ভাল মন্দের জ্ঞান নেই যেন, সুখ দুঃখের বোধ নেই সেই সরল মুখে। কিন্তু ডাগর দুই চোখে হরিণীর চাঞ্চল্য। অফুরন্ত যৌবনের জ্বলন্ত নিশানা। এক গণ্ডা বাচ্ছা বিইয়েছে দেখলে কে বলবে। একের পর এক পরীক্ষা চালিয়ে চলেছিল যেন কালীচরণ। রানীর দেহ থেকে তার নিজের উত্তরাধিকারীদের আবির্ভাব দেখে দেখে তার মনের সাধ কিছুতেই মিটতে চায়নি যেন।

জোসেফ আর চৌধুরী চালায় ফিরে দেখলো রাণী কার সঙ্গে হাসি তামাসা করছে। এমন দুর্যোগ চলেছে জানে না যেন। বাদলা দিনের আমেজটুকু বৃথা নষ্ট হয়ে যাবে! রাণীর আশেপাশে তার বাচ্ছা ক'টা, ভীরু বিড়ালছানার মত নিশ্চুপ বসে আছে।

রাণীর সামনে উবু হয়ে বসেছে লক্ষ্মণ সামন্ত। দু'জনে কি কথা বলাবলি করে কে জানে, জোসেফ আর চৌধুরীকে চোখের সমুখে দেখতে পেয়ে থমকে যায় কথা আর হাসির মধ্যপথে। রাণী একবার অপাঙ্গে লক্ষ্য করে, দুই আগন্তুকের থমথমে মুখ। চোখে চোখে নিরাশা।

লক্ষ্মণ সামন্ত ঘুরে ব'সলো। বললে,—কালীচরণ কৈ?

রাণীরও মনে ঐ একই প্রশ্নটার উত্তর চায়। বাচ্ছাদের সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় ঘোমটা টানতে চেষ্টা করে। বাইরে তখন

অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলেছে বাঁধাধরা ক্রুত ছন্দে। কড় কড় কড় বাজ পড়ছে।

চৌধুরী বলে,—মেলে নাই কালীচরণকে। পাত্তা নাই তার।

জোসেফ বলে,—সেই ভোর থেকে কালীচরণকে খুঁজতে খুঁজতে আমাগোর জান নিকলে গেছে। যীশুকৃষ্টের দয়ায় জান লিয়ে ফিরেছি।

কোথায় ডাক ফাটিয়ে কেঁদে উঠবে রাণী; সীঁথির সিঁদুর ঘুচতে বসেছে, কোথায় কান্নায় শোকে লুটিয়ে পড়বে, তা নয়। রাণী ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে বোবা চোখে। ছিন্নবাস তার, আঁচল বুকে টানে। কোলের বাচ্ছাটা ফুঁপিয়ে চকাচ্ছে। তাকে তুলে নেয় বুকে। রাণীর পলকহীন চোখের চাউনি ঘোরাফেরা করে এর ওর মুখে।

বন্যায় ভেসে-যাওয়া কালীচরণের প্রথম ছুটো ছেলের জ্ঞান হয়েছে কিছু কিছু। মৃত্যুর বিয়োগ ব্যথার অনুভূতি জেগেছে তাদের। ছেলে ছুটো ককিয়ে উঠতেই জোসেফ তাদের মুখে হাত চাপলো। বললে,—কাঁদতে নাই, কাঁদতে নাই।

বুকের ভেতর কেমন যেন একটা মোচড় লাগলো। রাণী শ্বাস ফেলতে পারে না কতক্ষণ। চোখ দু'টি কেন কে জানে বন্ধ করলো।

চৌধুরী আর জোসেফের মধ্যে অকারণ ব্যস্ততা দেখা দেয়। ঘর থেকে বেরিয়ে যায় জোসেফ। বড় ছেলে ছুটোর হাত ধরে নিয়ে যায় সঙ্গে। চাতালে গিয়ে বলে,—বাপ তোদের বেঁচে থাকতে কত মাস্তি করতিস্ তা আমার জানা আছে। মেয়েমান্‌সের মত কাঁদিস না আর, ঢের হয়েছে! বাপ কারও চিরকাল থাকে না।

ধমক খেয়ে থেমে যায় শোকার্ত ছেলে ছুটো। জোসেফের কড়া

কড়া সুরের কথা শুনে আর মদ খাওয়া লাল চোখের কড়া দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে ওরা যেন ক্রমশঃ আপন সত্তা হারিয়ে ফেলছে। ওদের কণ্ঠে কান্না গুমরে গুমরে ওঠে।

লক্ষ্মণ সামন্ত খানিক থ মেরে থাকে। অবিশ্বাস্য ঘটনা একটা শুনছে, তাই তার কপালে রেখা ফুটছে। ভুরু ছুটো বেঁকেছে। উঠে পড়লো লক্ষ্মণ। ঘর থেকে বেরিয়ে চাতাল থেকে বৃষ্টিঝরা মাঠে নামলো। ভিজতে ভিজতে চললো কোথায় কে জানে।

—যাও কমনে লক্ষ্মণ? জোসেফ চেঁচিয়ে কথা বললে। বৃষ্টি-পাতের ঝরঝর শব্দকে হারিয়ে দিয়ে। বললে,—কালীচরণের বাচ্ছা-গুলাকে খাওয়াবে কে? কি খাবে ওরা?

অনেক দূর থেকে অনেক মানুষের ঐকচিৎকার ভেসে আসছে। আকাশ-ছোঁয়া জলের ঢেউ ছুটতে ছুটতে তেড়ে আসছে পরম আক্রোশে। জোরালো বাতাস আর জলের আঘাতে জর্জরিত ঘর-ছুয়োর কুটোর মত ভেসে চলেছে। ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় ঘরের বাসিন্দারা। নীচু থেকে ওপরপানে ছুটতে থাকে। সমতল থেকে টিলা আর ঢিপিতে।

পাকা-সড়ক ধরে যেন ক্যারাভান চলেছে একটা—যার শেষ আছে কি না এখনও জানা গেল না। দূর থেকে দেখায় যেন ছার-পোকার সারি। কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে আশ্রয়ের আশায়। মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই চাই। গরুর গাড়ীতে চলেছে বুড়ো বুড়ী শিশু আর আসন্নপ্রসবা। বাস্তুহারাদের মুখে বিষাদের কালিমা। দুঃখ আর পরাজয়ের মলিনতা।

লক্ষ্মণ সামন্ত ফিরে আসে। চাতালে ওঠে না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বললে,—দেখি যদি কোথাও কিছু পাওয়া যায়। কালী-

চরণের মরাই দু'টাতো জলে ডুবে গেছে। রাণী বললে ঘরেও কিছু নাই। এক বেলার খাওয়া, তাও নাই।

—তবে এখন উপায়? জোসেফ বললে এধার ওধার দেখতে দেখতে। নিজের বুদ্ধিকে যেন প্রশ্নটা করলে। চোখে তার সন্ধানের দৃষ্টি যেন।

চটা-ওঠা কলাইয়ের তিনটে বাটিসমেত একখানা মাটির থালা কে চাতালে বসিয়ে দেয় ঘরের ভেতর থেকে। বাটি থেকে ধোঁয়া উঠছে। তিন বাটি গরম চা। দুধের বালাই নেই বোধ হয়, চিনি আছে কি না কে জানে।

চৌধুরী বললে,—চা খেয়ে যাও লক্ষ্মণ। আমাদের চা দিয়েছে রাণীবৌ।

তিনটে বাটি তিনজনে তুলে নেয়। চৌধুরী আর জোসেফ সেই সকাল থেকে জলে ভিজে ভিজে হেজে গেছে যেন। তাদের গা থেকে কেমন একটা মাছ-আঁসটে গন্ধ পাওয়া যায়।

একটা একটা দমকা বাতাসের আক্রমণে কালীচরণের মাটির ঘরখানা কেঁপে কেঁপে ওঠে। চালার বাঁশ ক্যাঁচক্যাঁচ করে। কপাট-গুলো পড়তে থাকে যখন তখন সশব্দে। কত সাধ আর কত সাধনায় ঘর তুলেছিল কালীচরণ! রাণীর একখানা একখানা গয়না বাঁধা দিয়ে টাকা এনেছিল কোথা থেকে।

চায়ের নিঃশেষ পাত্র চাতালে নামিয়ে রেখে চৌধুরী বললে,—চল্ লক্ষ্মণ, আমিও তুর সঙ্গে যাই। কিছু মিলবে কি কোথাও মনে হয় না। কথা বলতে বলতে চৌধুরী এক লাফে চাতাল থেকে নেমে পড়লো। জোরে জোরে পা চালালো। যেতে যেতে বললে,—জোসেফ, তুমি থাকো হেথায় আমাগোর আসাতক।

এক সঙ্গে সোজা চলতে চলতে চৌধুরী আর লক্ষ্মণ দুই বিপরীত

পথ ধরলো। বৃষ্টির জলধারা আর মেঘভরা আকাশের ছায়াআঁধারে দুজনে যেন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় দু'দিকে।

কোথায় একটা কোলাব্যাঙ ডেকে চলেছে অবিরাম। সাপের মুখে হয়তো সে আবদ্ধ এখন, ডাকছে তাই পরিত্রাহি। ঝড়োকাক ডাকছে দেবদারুর শাখায় শাখায়। নীড়হারা পাখীর দল ডাকাডাকি করছে। তাদের বাসা উড়ে গেছে ঝড়ের দোলায়।

ঘরের এককোণে আশ্রয় নেয় রাণী। ছলছল চোখ, থমথমে মুখের আকার। মাথার কেশ আলুথালু। বুকে যেন থেকে থেকে শোকের শিহর লাগছে। কালীচরণ নেই আর, চোখে অন্ধকার দেখছে রাণী।

জোসেফের ভয়ে ছেলে দু'টি কেমন স্তব্ধ হয়ে থাকে। কাঠের পুতুলের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার আকাশ দেখছে শূন্য দৃষ্টিতে। জল-ঠাণ্ডা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। আদুড় গা তাদের। ময়লা কাপড়, খাটো।

দাওয়ায় বসে পড়লো জোসেফ। হাল টেনে টেনে বুকে পিঠে কোমরে বেদনা লাগছে। জলে ভিজে ভিজে নাক থেকে কাঁচা জল ঝরছে। কালো সুতোয় বাঁধা খ্রীষ্টের ক্রুশ-চিহ্ন জোসেফের গলায় ঝুলছে। এক টুকরো নিখাদ রূপা যেন ঝিলিক তুলছে। জোসেফ দেখছে সাগ্রহে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখছে ক্লান্তচোখে।

বিজলী আলোর সুইচ টিপছে কে যেন। অন্তরীক্ষ থেকে জ্বালিয়ে দেয় একবার, নিভিয়ে দেয় তখনই। বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠছে আকাশদিগন্তে। গুরু গুরু মেঘ ডাকছে। ঘন ঘন মেশিন-গান দাগছে কে যেন।

—জোসেফচাচা!

এক শিশুর কলকাকলী। রাণীর একরত্তি মেয়েটা ঘর থেকে ডাক দেয়। বলে,—জোসেফচাচা, মা কাঁদছে।

উঠে পড়লো জোসেফ। দাওয়া থেকে ঘরের দুয়োরে এগিয়ে যায়। কি বলতে যায়, অথচ বলতে পারে না। মুখে কোন কথা আসে না। প্রায় অন্ধকার ঘরের মধ্যে দৃষ্টি চালিয়ে রাণীকে খুঁজতে থাকে। কৈ, সেই শোকাতুরা ?—কৈ রাণীবৌ ?

ঘরের এককোণে রাণী। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে চোখে আঁচল চেপে। দুরন্তযৌবনা রাণী আজ কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেহ-মনে। মাথায় সিঁদুর উঠবে না আর, গায়ে গয়না উঠবে না। যাকে হারিয়েছে আর তাকে ফিরে পাবে না।

—রাণীবৌ!

একটা ডাক দিয়ে ঘরে ঢুকলো জোসেফ। তার বিশাল ছাতি দুয়োরের বাইরের সামান্য আলোটুকু আসতে দেয় না। খড়ের চালাঘর টলমল করছে ঝড়ের হাওয়ায়। বাঁশ-বাখারী ক্যাঁচক্যাঁচ করে।

স্বভাবসুলভ মুখে হাসি মাখাতে চেষ্টা করে রাণী। চোখ থেকে আঁচল নামিয়ে নেয়। সজল চোখ আর হাসিতে বড় করুণ দেখায় যেন রাণীকে। কপাল থেকে চুল সরিয়ে দেয় বার বার।

শ্বাসের আওতায় এগিয়ে আসে জোসেফ। রাণীর কাছাকাছি। আত্মপ্রত্যয়ের জোরে কথায় জোর দিয়ে দিয়ে বললে,—ভাবনা কি তোমার রাণীবৌ ? আমরা যখন আছি—

কথা বলতে বলতে রাণীর একখানি নধর-নরম হাত জোসেফ নিজের হাতে ধরলে। সংসারের কত শত কাজেও রাণীর হাতে কড়া ধরেনি!

হাত ছাড়িয়ে নিতে চেয়েও পারে না যেন রাণী। চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক লজ্জা নামে তার মুখে। জোসেফের চোখে চোখ রাখতে পারে না বেশীক্ষণ। বুক দুরুদুরু করে যেন।

রাণীর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় জোসেফ, ঘরের পেছনের দাওয়ায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে রাণী। তার বন্ধুর বুক, থেকে থেকে ফুলে ফুলে উঠছে। রাণী যেন সর্বহারা, তাই বাধা দেয় না আর। মুখে তবু হাসি মাখিয়ে বললে,—কোথায় চললে এমন?

—চল' খানিক কথা বলবে। ভুলে থাকবে শোকের জ্বালা। জোসেফ চলতে চলতে কথা বলে মিহি সুরে।

—ছেলেমেয়ে যে এখনও খেতে পায়নি! মুখে জল পড়েনি ওদের। রাণীর কাঁপা কাঁপা কথায় সব হারানোর ব্যর্থতা। সে যেন চলার গতি হারিয়েছে দেহের শিথিলতায়। নেহাৎ তাকে টেনে নিয়ে যায় তাই লুপ্তশক্তি স্থাবরের মত রাণীকে যেতে হয়।

দখিন বাঙলার এক জেলে-মাঝি জোসেফের বজ্রমুঠোয় বন্দী রাণীর হাতখানি, করপীড়নে যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। বুক থেকে খসে-পড়া আঁচল বুকে তুলে নেয় রাণী। ঘরের ফাট-ধরা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় লজ্জাশীলার মত।

—ঘরে কিছু নাই না কি? জোসেফ সহানুভূতির সুরে শুধোয়। চোখে জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে।

—যা আছে তা ওরা খায় না। আছে মুড়ি-কড়াই, কদমা বাতাসা। রাণী ইতি উতি দেখতে দেখতে ফিসফিসিয়ে বললে। কপাল থেকে চুল সরিয়ে দেয় আর কথা বলে,—ওদের এসব খেতে দিই না অসুখের ভয়ে। পেটের ব্যামো হয়।

—কি খায় তবে? জোসেফ প্রশ্ন করলে ভুরু বাঁকিয়ে। বললে,—কোথাও কিছু মিলবে না আর। দোকানপাট হাটবাজার বসবে না কতকাল। কথা বলতে বলতে জোসেফ শরীরের বেদনার তাড়নায় বসে পড়লো দাওয়ায়, রাণীর ঠিক পায়ের কাছে।

সাপের মত আঁকাবাঁকা, বিদ্যুতের লেলিহান শিখা হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটতে থাকে উল্কার বেগে। গজরাতে থাকে ঘনকালো মেঘের স্তর। কামান দাগার মত গুম গুম আওয়াজে মাটির পৃথিবীর ভিৎ কেঁপে কেঁপে ওঠে।

রাণী ভিজে চোখ মুছতে মুছতে বললে,—ওরা পান্তা আর ব্যান্নন খায়। ভাত না খেলেই অসুখে পড়ে।

—এক কণা চাল কোথাও মিলবে না। মরাই-ফরাই জলে ডুবে গেছে, ভেসে গেছে। জোসেফ মুখ উঁচিয়ে বললে। নিরুৎ-সাহের সঙ্গে।

জলের ডাক শোনা যায়। সমুদ্রের গর্জন যেন! স্ফীতকায় জলের পাহাড় বয়ে চলেছে, উদ্দাম গতিতে। রাণীর চোখে পড়লো বাস্তুহারা মানুষের ঐ লম্বা মিছিলটা—নয়াশড়ক ধ'রে চলেছে আশ্রয়ের আশায়। জলের ভয়ে ঘর ছেড়েছে। ছারপোকার সারি চলেছে যেন। কালো কালো মাথা শুধু দেখা যায়। অতিবৃষ্টির তাণ্ডবলীলায় গ্রামের মানুষে কলহদ্বন্দ্ব ভুলে গেছে। সমাজের রীতিনীতি ধুয়ে মুছে গেছে। জাতি-অভিমান নেই আর। আজ সকলেই এক।

কেমন যেন নিথর হয়ে থাকে রাণী। কোলের বাচ্চাটা হামা দিতে দিতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে। তার হারিয়ে যাওয়া মাকে দেখতে পেয়ে খুশী খুশী হাসে আপন মনে। বোধশক্তি নেই তাই এত দুঃখেও হাসে মিটিমিটি।

থেকে থেকে বুকটা গুমরে গুমরে উঠছে। চোখ ফেটে জল। রাণী আবার আঁচল চাপলো চোখে, ফুঁপিয়ে উঠলো একবার বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে।

জোহেক ফিসফিস বললে,—এত কাঁদাকাটা করলে সে কি ফিরে আসবে রাণীবৌ ?

আবার মুহূর্তের মধ্যে সেই স্বাভাবিক একটু হাসি হাসলো রাণী। চোখের জল লুকাতে চাইলো মুখে হাসি মাখিয়ে। বললে—ঘরে যাই আমি ? চোখে দেখতে পারছি না এই ঝড়বিষ্টি। ভয় ভয় করছে।

কাজল-কালো রঙের ছায়া দিগ্বিদিকে, ঘরে প্রায় আঁধার। সকাল, দুপুর না সন্ধ্যা ঠিক ঠাওর করা যায় না যেন। সায়াহ্নের চিহ্ন যেন হেথায় সেথায়। জলের ডাক, প্রলয়-বন্যাবিধ্বস্ত মানুষের হাহাকার, বৃষ্টির নাচানাচি আর বাতাসের দাপাদাপিতে বিকট এক ভয়াবহতার সৃষ্টি হয় যেন। এমন দুর্দিনে নিজের ছায়া দেখলেও ভয় হয়। হাওয়ার সোঁ সোঁ শোনায় যেন অনেক প্রেতাত্মার ফিস-ফিস কথা। যেন এক ষড়যন্ত্র চালিয়েছে কারা, চোখের অন্তরাল থেকে। গোটা মানুষ-সমাজের বিরুদ্ধে।

ঘরে নয়, রসুইশালে যায় রাণী। শিকে থেকে মুড়ি-কড়াইয়ের হাঁড়িটা নামায়। বাচ্ছাগুলো কোথায় ছিল, একে একে আসে ঠিক লোভে লোভে। ছেলে দুটো আর মেয়েটার হাতে হাতে দিয়ে দেয় একেক আঁজলা। কচিটার মুখের কাছে ফেলে দেয় এক টুকরো কদমা। চোখ ছলছল করছে, বাচ্ছাদের যেন লুকোতে চায় রাণী। বুকটা থরথর কাঁপতে থাকে। বাচ্ছা তিনটে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। যে অজ্ঞান সে শুধু থাকে রাণীর কাছে। কদমা চিবোতে চেষ্টা করে দন্তহীন মাড়িতে। রসুইয়ের দুয়োরে শিকলি তুলে দিয়ে ফিরতে গিয়ে কার যেন ছোঁয়া লাগে পিঠে। রুখু-রুখু চুলের বোঝায় লাগে কার সজোর শ্বাস। চোখে জল, তবুও লজ্জানত মুখে সেই একটু মিষ্টি হাসি ফুটে ওঠে। কড়্ কড়্ বাজের শব্দে চমকে চমকে ওঠে রাণী।

নয়াশঙ্করের মিছিলটার গতি যেন মন্থরতর হয়েছে। তেমন আর হাঁকডাক নেই ঘন ঘন। ঐ তল্লাটের গ্রামে হয়তো মানুষ রইলো না আর কেউ। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ আর ভিটে আগলানো, একটাও কেউ চাইলো না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে আবার। যেন এক প্রকট ভয়, ক্ষণে ক্ষণে এগিয়ে আসছে নীরব হাসতে হাসতে।

পাকা-শহরের কাছাকাছি ফাঁকা জমিতে ঘর বাঁধছে বাস্তুহারা। সবুজ ঘাসের ভিজে বিছানায় ছড়িয়ে পড়ছে শ'য়ে শ'য়ে। সকলের চোখে অজানা ভবিষ্যতের ভাবনা। খড়ের চালা বানিয়ে নিয়েছে একেকখানা, চারটে খুঁটি বাঁশের। মাথা বাঁচবে। জলে ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা নেই শহরপ্রান্তে।

বন্যার্তদের মাঝে আজ যেন অটুট মৈত্রী। ভেদাভেদ নেই, এক হাঁড়িতে ভাত চেপেছে। শিশুরা জল-দুধ খায় এক আধার থেকে। মেয়েরা যেন একটি সংসারের কাজে লেগেছে। গ্রামে নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল না কখনও, এখানে সকল নিয়ম সকলে পালন করছে।

জোয়ানরা বয়স্কদের মান্য করছে। মেয়েদের লজ্জা-শালীনতা বজায় থাকছে। কেউ কারও অনিষ্ট করছে না। শিশুর দল বাধ্য হয়েছে। ভাঙা দেউলের দালানে সারি বেঁধে ব'সে আছে তারা, আঁধার আকাশে চোখ তুলে।

মাটির ধ্বস নামছে, দূরে কোথায়। একটানা জলের গর্জন ছাপিয়ে শোনা যায়। কত গাছ বনস্পতি ভেঙে ভেঙে পড়ছে। মত্ত জলবেগে ভাসতে ভাসতে চলেছে।

খড়ের চালার তলায় তলায় রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতেই হ্যারিকেন জ্ব'লে উঠতে থাকে কোথাও কোথাও। ঝড়ের দোলায়

হ্যারিকেনের শিখা নিভে নিভে যায়। বাতাস চলেছে দুরন্ত গতিতে। রাত্রি ঘনিয়ে আসছে।

—জোসেফ!

একসঙ্গে সকলকে চমকে দিয়ে, অন্ধকার থেকে হঠাৎ ঘরের দুয়োরে এসে হাজির হয় চৌধুরী। কোথা থেকে একটা টোকা জোগাড় ক'রেছে চৌধুরী। চোখাচোখি হতেই বললে,—আর কিছু মেলে নাই জোসেফ।

কেঁদে কেঁদে ফুলে-ওঠা চোখে কোন কৌতূহল নেই। রাণী তাকালো যেন জ্বরের রোগীর মত চাউনি। বাচ্ছা ক'টা আগ্রহে ভিড় জমালো চৌধুরীর আশেপাশে। ঘরের এককোণে একটা প্রদীপ জ্বলছে কাঁপা কাঁপা।

একটা মোরগ ঝুলছে চৌধুরীর হাতে। কার ফেলে যাওয়া ভিটে থেকে চুরি করেছে চৌধুরী। ধরতে না ধরতেই গলা মটকে দিয়েছে, পাছে মোরগটা চেঁচায়। আর এক হাতে টাটকা পালঙ শাক এক গোছা। টুপ টুপ জল ঝরছে এখনও পালঙের সবুজ সতেজ পাতা থেকে। কাদের ক্ষেত থেকে উপড়েছে চৌধুরী।

আনন্দের হাসি জোসেফের মুখে। ঘর থেকে দাওয়ায় বেরিয়ে পড়লো মুক্ত হাওয়ায় শ্বাস নিতে কয়েকটা। খানিক চুপচাপ থেকে বাইরে থেকে বললে,—মুরগীর ঝোল, পালঙ-সেদ্ধ, জমবে খুব ভাল। তবে রাণীবৌ কি রাঁধতে পারবে এই ভাঙামনে?

তার আগেই রাণী এগিয়ে এসে চৌধুরীর হাতের জিনিস নিয়ে গেছে রসুই ঘরে। ভিজে কাঠে আগুন ধরাতে বসেছে।

দড়ির একটা খাটিয়া দাওয়ার একপাশে। জোসেফ আড় হয়ে শুয়ে পড়লো খাটিয়া টেনে। পাঁজরা আর পিঠের হাড় ভেঙে নেয়,

কেমন দেহ বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে। সারাদিনের ক্লান্তিতে চোখে যেন ঘুম নামছে জোসেফের। ঠাণ্ডা শিরশির হাওয়ায় শীত শীত করে। গায়ে একখানা শাড়ী জড়িয়েছে জোসেফ। রাণীর ফেঁসে যাওয়া কাপড় একখানা। স্যাঁতস্যাঁত করছে।

—চৌধুরীভাই!

সুর শানিয়ে ডাক দেয় জোসেফ। বৃষ্টিঝরার শব্দে চাপা প'ড়ে যায় জোসেফের ভাঙা কণ্ঠ। আবার ডাকে,—বলি ও চৌধুরী-ভাই!

সাড়া দেয় না চৌধুরী। খাটিয়ার পাশে এসে জোসেফের পায়ের কাছে বসে। পা দুটো টেনে নেয় জোসেফ। বলে,—দু'এক পাত্র মিলবে না?

—হাঁ মিলবে বৈ কি। তবে তুকে আমার ভয়। বেহুঁস হবি এখুনি। চৌধুরী কথা বলছে প্রায় চুপিচুপি।

দুর্যোগের রাত, চৌধুরীও যেন খুশী হয় মনে মনে। শরীরটা চাঙ্গা হবে কেন তবে!

—মা মেরীর দিব্যি চৌধুরী, কোন শালার বেটা শালা বেহুঁস হয়! জোসেফ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললে।

—লক্ষ্মণ সামন্ত ফিরে নাই এখনও। সে আসুক, তারপর। চৌধুরী কথা বলতে বলতে খাটিয়া ছেড়ে উঠে পড়লো। বললে,—আছে, কালীচরণের ঘরে এক আধ জালা। চোলাই।

ভাঙা খাটিয়া, ক্যাঁচক্যাঁচ করে জোসেফের চাঞ্চল্যে। পা দু'টাকে ছড়িয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে ভাবতে থাকে, লক্ষ্মণ সামন্ত কেন এখনও ফিরছে না। কালীচরণের মত লক্ষ্মণও যদি আর ফিরতে না পারে! জোসেফের চোখ অন্ধকার আকাশে। বিজলী জ্বলছে থেকে থেকে, প্রগলভার দল চটুল হাসি হাসছে যেন।

—রাণীবৌ!

রসুইঘরে সিঁদিয়ে যায় চৌধুরী। ডাক দেয় একটা। রাণী শিউরে শিউরে ওঠে। আলগা পিঠ ঢাকলো আঁচল টেনে টেনে। চুল্লী জ্বলছে একটা। ভিজে কাঠ থেকে ধোঁয়া উঠছে। মিষ্টি হাসির রেখা, উনুনের স্বল্প আগুনের আভায় দেখতে পায় চৌধুরী। একটু হাসি, দেখা দেয় আর মিলিয়ে যায়। চোখ ফিরিয়ে দেখে রাণী। কি যেন তার মুখে ভ'রে দেয় চৌধুরী। খাইয়ে দেয় সজোরে। ফিসফিসিয়ে বলে,—খেয়ে ন্যাল্ বৌ।

একটা কচি শশা। চৌধুরীর হাত রাণীর মুখে চাপা। অগত্যা চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে হয় তাকে। খেতে খেতে বলে,—ছেলেমেয়ে এসে পড়বে। দেখতে পাবে যে।

হিমশীতল কপাল রাণীর। ভাগ্যহীনার কপাল। চৌধুরী ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দেয় রাণীর ঠাণ্ডা কপালে। তার রুখু রুখু মাথায়। চৌধুরীর মত কঠোর কঠিন মানুষও এখন কত ধীর স্থির শান্ত!

বাচ্ছাদের একটাকে আসতে দেখে চৌধুরী রাণীর মুখের নরম চিবুক ছেড়ে দিয়ে রসুইঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে। তৃপ্তির হাসি তার মনে যেন লুকিয়ে আছে। সারাদিনের ক্লান্তি নেই আর। সঞ্জীবনী-সুধা খেয়েছে যেন সে। ঘরের অন্ধকার কোণে কোণে চৌধুরীর ব্যগ্র দৃষ্টি কি যেন খুঁজতে থাকে একান্ত লালসায়।

চোলাই মদের জালাটা চোখে পড়তেই এক ঝলক হাসলো চৌধুরী। ছোট একটা কলসী ডুবিয়ে দেয় জালায়। নীরব ঘরে কলসী ভর্ত্তি হওয়ার অপ্ অপ্ অপ্ শব্দটা শুধু শোনা যায়। চৌধুরী

[illegible] ভাবছে, কয়েক পাত্র চোলাই খাওয়ার পর মুরগীর ঝোল-মাংস, স্যাঁকা রুটির সঙ্গে। তারপর—

আবার চমকে ওঠে রাণী। কে তাকে ছুঁয়েছে কে জানে! ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, পেছনে বড় ছেলে দুটো। তাদের ব্যাজার মুখ। ক্ষুধার জ্বালা ফুটেছে শোকার্ত চোখে। কি যেন বলতে চাইছে, অথচ কার ভয়ে বলতে পারছে না।

ম্লান হেসে রাণী বললে,—বুঝেছি, ভুখ্ লেখেছে।

ছেলে দু'টি ওপরে নীচে মাথা দোলায়। ক্ষুধা-আধিক্যের বিরক্তি ওদের মুখে। একজন বললে,—বাবা আর আসবেনি?

আবার নিথর নিস্পন্দ হয় রাণী। কেমন একটা চাপা ভয় আর ভাবনায় যেন কাঠ হয়ে যায়। উনুনের লালচে আলোয় ছেলেরা দেখতে পায়, তাদের মা কাঁদছে। দরদর জল ঝরছে চোখ থেকে। ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে। রাণী হাঁ না কিছুই বলতে পারে না। একবার ফুঁপিয়ে জলভর্তি হাঁড়ি বসিয়ে দেয় উনুনে। বঁটিটা টেনে নেয় কোথা থেকে। এখন মুরগীর মাংস টুকরো টুকরো করতে হবে। রাণী যেন নিরুপায়।

কলসীটা দেখতে পেয়ে জোসেফ পরম আগ্রহে তড়বড়িয়ে উঠে পড়লো। সজোর হাসি, তৎক্ষণাৎ চেপে নিয়ে বললে,—চৌধুরী, আমাকে আগে দাও এক পাত্তর। গায়ে-হাতে বেদ্না লাগছে বড়। নাক দিয়ে কাঁচা জল ঝরছে।

খাটিয়ার একধারে চৌধুরী ব'সলো পা মুড়ে। কলসী আর পাত্র রাখতে রাখতে বললে,—কে আসে জোসেফ? একটা মানুষেরে আসতে দেখছি।

কালীচরণ নয়তো! জোসেফ দৃষ্টি চালিয়ে দেখতে থাকে।

সত্যি কে যেন আসছে ছায়ার মত। অন্ধকারে দেখা যায়, একটা মূর্তি এগিয়ে আসছে দাওয়ার দিকে।

—পেটে না পড়তেই লেশা ধ'রলো চৌধুরী? হেসে হেসে বললে জোসেফ। বললে,—কে আসছে চিনলে না?

—উঁহু। বললে চৌধুরী।

কালীচরণ না তার প্রেতমূর্তি কে জানে! হয়তো মায়া কাটাতে পারলো না, পেছনের টানকে ভুলতে পারলো না কালী-চরণ। যাদের ফেলে গেছে তাদের কাছে আবার ফিরে এলো মহাকাশ থেকে।

জোসেফ বললে,—চলন দেখে ঠাওরাতে পারলে না? ও তোমার লক্ষ্মণ সামন্ত।

স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললো চৌধুরী। কালীচরণ কিম্বা তার ছায়ামূর্তি নয়। লক্ষ্মণ সামন্ত হনহনিয়ে আসছে বৃষ্টিকে উপেক্ষায়। কোথা থেকে লক্ষ্মণও একটা টোকা জোগাড় করেছে। মাথা বাঁচিয়েছে।

—লক্ষ্মণ না কি হে? চৌধুরী তবু একবার সঠিক হ'তে গলা খাঁকরে শুধোয়।

—হাঁ গো।

—এ্যাত্ দেরী কেনে? ছিলি কমনে? চৌধুরী কলসী থেকে ঢালতে ঢালতে আবার কথা বললে। পাত্রটা এগিয়ে দিলে জোসেফকে।

এক চুমুকে আধ পাত্র গলা থেকে বুকে সিঁদিয়ে দিয়ে জোসেফ খানিক মুখ বিকৃত করে। তারপর যখন অনুভবে বুঝতে পারে জলীয় পদার্থটুকু গলা থেকে বুকে নামছে অতি ধীরে ধীরে, তখন একটা বিজাতীয় আনন্দের ঝিলিক খেলে তার মুখে।

অন্ধকারে কেউ দেখতে পায় না। তার চোখে তখন ঝিরিঝিরি বর্ষার রাত।

মুখে মুরগীর নরম মাংসের আস্বাদ। বুকে একরাশ কামনা, তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলছে। মনের হাসি লুকিয়ে জোসেফ অন্য এক সুরে বললে,—সামন্তর পো, কিছু মিলেছে?

—তেমন কিছুই নয়। লক্ষ্মণ সামন্ত দাওয়ায় উঠে পড়লো। টোকা রেখে দিলো দাওয়ার দেয়ালে। বললে,—তেমন কিছুই নয়। এই গোটা কয়েক বেগুন, দু'টো ঝিঙে, ক'টা কাঁচকলা।

—চুরি করেছিস তো? চৌধুরী বললে বিজ্ঞের মত।

—হাঁ গো। লক্ষ্মণ সামন্ত ঘরে যায় কাকে খুঁজতে। কার মুখখানি বেন দেখতে। ঘরে দেখা নেই তার। লক্ষ্মণ রসুইঘরের দিকে চলে ব্যস্ত পায়ে। রাণীর পায়ের কাছে মাটিতে নামিয়ে দেয় সব্জী-পত্র। কোঁচড় উজাড় ক'রে দেয় যা আছে।

পিছু ফিরেছিল রাণী। উনানে জলের হাঁড়ি চাপিয়ে মরা-অহল্যার মত বসেছিল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে একবার। বললে, —মিথ্যা কষ্ট করলে কেনে? কি হবে? কে খাবে এ সব যজ্ঞির খাওয়া?

—কেন? লক্ষ্মণের চোখে আর কথায় বিস্ময়। বললে,—বাচ্ছাগুলো খাবে। তুমি খাবে। আমরাও পাত পাড়বো আজ এই ঘনঘটার রাতে।

—বাচ্ছাগুলো খাবে না। কথা বলতে বলতে রাণী মাথা দোলায় নেতিবাচক। বলে,—ওরা খায় না গো, খায় না।

—কি খায় তবে? সোনাদানা? লক্ষ্মণ বললে অবাক সুরে।

এক ঝলক হাসি ফুটলো রাণীর মুখে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না দুঃখের হাসি লক্ষ্মণ ঠিক ধরতে পারে না। মুখের হাসি মিলাতে রাণী

বললে,—কি যে বল' তার ঠিক নেই! গরীব-গরবা আমরা, সোনা-দানা পাবো কোত্থেকে?

বজ্রপাতের কড়কড় শব্দ ছোটে আকাশে। কোথায় যেন তৃতীয় মহাযুদ্ধের মহড়া শুরু হয়েছে। পদদলিত হয়েছে বিশ্বশান্তির কপচানো বুলি। মর্টার না মেশিনগান দাগছে কারা যেন। রসুইয়ের জানলা থেকে দেখা যায়, দূরে একটা শিশুগাছের শিখর জ্বলছে। শ্মশানের চিতার মত উর্দ্ধগামী আগুন কালো আকাশে। ঝড়ো হাওয়ায় বজ্রপাতের ধোঁয়া, পোড়া পোড়া গন্ধ যেন।

—কি খায় তবে? দুধ-ক্ষীর?

—না গো না। ওরা ভাত খায় এবেলা ওবেলা। ভাত ছাড়া আর কিছু খায় না। সহ্যি হয় না পেটে। রাণী এক দমে কথা কটা ব'লে আবার যেমনকার তেমনি নতমুখী হয়ে থাকে।

—হাসালে বৌঠাকরুণ। লক্ষ্মণ হেসে হেসে বললে। আকাশে যেন মশাল জ্বলছে একটা। সেই আলো দিকে দিকে ছড়িয়েছে। লক্ষ্মণ রসুইঘরের ফাঁক-কপাট থেকে দেখতে পায় জল ঝরছে শুধু। সাদা কাঁচকাটির মত পড়ছে অশ্রান্ত ধারায়। একটা বাঁধাধরা ছন্দে। যুদ্ধগামী সৈন্যদলের রুট্‌-মার্চের সুরে।

—ধান-চাল মিলবে কোথায়? পাবে না, পাবে না, পাবে না। লক্ষ্মণ তিন সত্যি গালছে যেন। বললে,—মরাই-করাই কোথায় কমনে ভেসে গেছে তার ঠিক নেই।

রাণীর চোখে যেন চিন্তা ফুটলো। ধান-চাল যদি না মেলে, দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন যদি না পাওয়া যায়, বাচ্ছা ক'টার পেটে যদি ভাত না পড়ে! তবে বাচ্ছারা মারা পড়বে।

আকাশে জ্বলন্ত মশালের মত বজ্রদগ্ধ শিশুগাছ জ্বলছে জ্বলছে।

কখন নিভে যায় বৃষ্টির জলধারায়। আবার সেই আঁধারে ঢাকা পড়ে আকাশ জল মাটি।

—বৌ! লক্ষ্মণ ডাকলো মিনতির সুরে।

—কি গো!

জামীরা, মাতলা, রায়মঙ্গল, মালঞ্চ, আর হরিণঘাটার জল আর পৃথক নেই। বর্ষা-বন্যায় একাকার তারা। একটা চাপা গর্জন কখনও কখনও স্পষ্টতর হয়। প্রবল বেগ জলের। যেমন গতি তেমন ভার। ফাঁপা ফোলা ঢেউ একটা একটা। গজরাতে গজাতে ছুটছে, যেদিকে খুশী।

—লক্ষ্মণ সামন্ত!

কে যেন ডাক দেয় কাছ থেকে। একেবারে পাশ থেকে। লক্ষ্মণ চমকে চমকে সাড়া দেয়—অ চৌধুরী! কিছু বলবে?

পাক্কা দু'পাত্র চৌধুরী যখন শেষ করেছে, তখন একটা বিবেচনার তাগিদেই পানে বিবত্তি দিয়ে স্রেফ উঠে পড়েছে চৌধুরী। কালাচরণের অকাল মরণের, অদেখা দুর্ঘটনাটা হঠাৎ মনে পড়েছে যেন। চৌধুরী বললে,—সামন্ত, তুমি আর রাতে যাবে না কি ঘাটে?

—যাবোনি চৌধুরী, বল' কি গো! লক্ষ্মণ ভিজে কাপড় নিঙড়ে নিঙড়ে জল ছেঁচে আর বলে। বললে,—ঘরে বসে থাকলে চলবে কেনে? যাত্রীর দল এখন টাকা লুকিয়ে দেবে। শুধু পারাপার জল থেকে একটা কোথাও ডাঙায়। সোনারূপো দিচ্ছে যে গো জান বাঁচাতে!

তবে তো একটা দোসর জুটবে বরাতে। চৌধুরী টেনে টেনে যেন কথা বলছে। কেমন যেন গম্ভীর সুরে। বললে,—আমিও যাবো সামন্ত। দু'দশ টাকা কামিয়ে লিই এই বাজারে।

নৌকার হাল টানতে হবে, দাঁড় ধ'রে ঢেউয়ের পর ঢেউ সামলাতে হবে। চৌধুরীর ব্যথাধরা পেশীগুলি ফুলে ফুলে ওঠে। হাত আর পায়ের হাড় মটকায় চৌধুরী। গাঁটে গাঁটে যেন বেদনা ধ'রেছে। প্রহরের পর প্রহর জাগতে হবে এই বর্ষামুখর প্রলয়ের রাতে। জলের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে চালিয়ে বিপদের কবল থেকে রক্ষা করতে হবে নৌকাভর্তি যাত্রীদের। রাশি রাশি তীরের মত বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে বিঁধবে সদাক্ষণ। সহ্য করতে হবে নীরবে।

—নাই বা যাও এই ঝড়ের রাতে। কার উদ্দেশে বললে রাণী, কোমল সুরে। বললে—তেনাও এই টাকার লোভেই গেছিলো। কত মানা করেছি, কান দেয় নাই।

কালীচরণও ঝড় আর বৃষ্টিকে অবজ্ঞা করেছিল। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিল রাণীর নিষেধ শুনে। টাকার লোভ, অর্থের মায়া ছিল কালীচরণের প্রচণ্ড। মানুষ মাত্রেই হয়তো থাকে অর্থ-প্রীতি। কালীচরণ তার বাচ্ছা ক'টার মুখ চেয়ে টাকার প্রতি আসক্ত হয়। বাচ্ছাগুলো যদি মানুষ হয়! খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে পরিপূর্ণ একটা মানুষে পরিণত করতে সত্যিই টাকার দরকার হয় অফুরন্ত। পৃথিবীতে দুঃখের মূল্য নেই, সুখের অগ্নিমূল্য।

রাণীর কথায় চৌধুরী হেসে হেসে বলল,—আমরা বৌ পাপী, পাজি। আমাদের জন্যি কি যমরাজ দয়া করেন এত চটপট! বরাতে কত কষ্ট আছে এখনও।

বোধহয় এক আধ পাত্র দেশী চোলাইয়ের প্রতিক্রিয়া ধ'রেছে চৌধুরীর মাথায়। তাই নিজের আসল রূপটা মুখে ব'লে ফেলছে। কত পাপ ক'রেছে চৌধুরী তার ইয়ত্তা নেই। আজই না হয় শান্ত সুবোধ বালকের মত জাতকাজে লেগেছে, নয়তো এককালে

চৌধুরীর নাম শুনলে এ তল্লাটে অনেকের বুকে ভয়ের কাঁপন লাগতো। হত্যা, রাহাজানি, বলাৎকার—কিছুই বাদ দেয়নি চৌধুরী। কিন্তু এমনই আশ্চর্যের কপাল যে রেহাই পেয়ে গেছে বার বার। অবশ্য চৌধুরীকে ফেরারী হয়ে এখানে সেখানে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে কত কতদিন। মাসের পর মাস। বছর বছর। চৌধুরীর তামাটে শরীরে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। আঘাত আর আক্রমণের লিখিত স্মৃতির মত একটা একটা কাটা দাগ এখানে সেখানে।

—রাণীবৌ, যা হয় দাও তাড়াতাড়ি, খেয়ে বিদেয় হয়ে যাই। লক্ষ্মণ সামন্ত আকাশে চোখ তুলে বললে কেমন যেন ক্ষুধার্তকণ্ঠে। বললে,—ততক্ষণ একটুক জিরিয়ে লিই। ব্যথা ধরছে গায়ে।

—এত ব্যস্ত কেনে তুই! ধমকে উঠলো চৌধুরী। বললে,—আয়, আমার সঙ্গে আয়। ব্যথামরার ওষুধ খাওয়াবো।

বৃষ্টিঝরার সমতালের ছন্দ নেচে চলেছে ঘরের চালায়। কারা যেন একসঙ্গে অনেক লাঠির আঘাত চালিয়ে চলেছে। ঘন অন্ধকার হেসে হেসে উঠছে বিদ্যুতের লহরীতে। বানের জল কেমন হুঙ্কার ছাড়ছে থেকে থেকে। মাটির ধ্বস নামছে জলে। একটা ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়ছে যেন নানা শব্দের আলোড়নে। মানুষের চিৎকার ভেসে আসে কখনও।

লক্ষ্মণ সামন্ত দাওয়ায় আসতেই তার হাতে একটা পাত্র জোর ক'রে ধরিয়ে দেয় চৌধুরী। কেমন চাপা ক্রোধের সঙ্গে বলে,—লে ঢকঢকিয়ে খেয়ে ফ্যাল্। ব্যথা কোথায় যে পালাবে তার ঠিক নেই।

আঁধারে দেখা যায় না, লক্ষ্মণের মুখে খুশীর হাসি ফুটেছে। হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছে। বললে,—বাঁচালে চৌধুরী ভাই, তোমার একশো বছর পেরমায়ু হোক।

নেশার আমেজ ধরেছে যেন। চৌধুরী খাটিয়ায় ব'সে পড়লো। কেমন যেন জড়ানো সুরে বললে,—জোসেফ তুই থাকবি, আমি আর লক্ষ্মণ পারঘাটে যাবো।

—ভাল কথা। বললে জোসেফ। তার কপালের দুই তীর দপদপ করতে শুরু করেছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন নতুন রক্তের চলাচল অনুভব করছে সে। নেশার একটা ক্ষীণ আবেগ ধরছে যেন বুকের মধ্যে। বুকের ছাতি ফুলে ফুলে উঠছে। জোসেফ বলে আপন মনে,—পাহারা দেবো আমি। সারারাত জেগে বসে থাকবো।

ফিসফিস বললে চৌধুরী,—তোর কর্তব্যজ্ঞানটা দেখছি খুবই টনটনে!

—তা তুই যাই বল চৌধুরীভাই। জোসেফ কথার শেষে এলিয়ে পড়লো খাটিয়ার এক পাশে। বললে,—আমার ধর্মগুরু বলেছিল, কাজে হেলা দিও না কখনও। যে কাজে নামবে তার জন্যে জান দিতে ভয় পাবে না। বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে যীশুর নামে।

দাওয়ায় থৈ থৈ জল। বৃষ্টির ঝাট আসছে একটা একটা। চৌধুরী, জোসেফ আর লক্ষ্মণের মুক্তদেহ ভিজিয়ে দিয়ে যায়। খেয়াল নেই তাদের। জলের দেশের মানুষ তারা, জলকে ডরায় না।

—তোর ধর্মগুরু কে রে জোসেফ? চৌধুরী প্রশ্ন করলে ঢুলু-ঢুলু নেশায়।

—বিশপ লামসডেন। তেনাকে আমরা দেবতা জ্ঞান করি। জোসেফ কথার শেষে ছাতির দুই প্রান্তে আর কপালে হাত ঠেকালো। গুরুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা-প্রণাম জানায়। বললে,—গত সালে লামসডেন মারা গেছেন। আমাদের কবরখানায় আছে তাঁর শরীলটা।

খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক লামসডেন তাঁর শিষ্যবর্গকে যেন ছেড়ে যেতে পারলেন না, তাই দেহ দান করেছেন বিদেশী ভূমিতে। লামসডেন জাতিতে স্কচ্।

কালো আকাশে দানবের হাসির মত এক রাশ বিদ্যুতের আলো ঠিকরে ঠিকরে মিলিয়ে যায়। যত দূর দৃষ্টি চলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে খানিক। কড়কড়িয়ে মেঘ ডাকতে থাকে। বৃষ্টির বেগ একটু জোরালো হয় আবার।

—আর এক পাত্র দাও চৌধুরীভাই। বুঝতে পারলাম কোথাকে তলিয়ে গেছে। সবটুকু শেষের পর মুখ মুছতে মুছতে বললে লক্ষণ সামন্ত। বললে,—ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত ধরছে যেন।

বাতাসও ক্ষেপে উঠেছে যেন বিরামবিহীন বর্ষণে। দিকের জ্ঞান নেই, উন্মাদের মত বইছে যেদিকে খুশী। হাওয়ার বেগ কখনও তীব্র, কখনও মৃদুমন্দ। থেকে থেকে ডাকছে সাঁই সাঁই। কখনও মৌনী হয়ে পড়ে কি এক বিরাগে।

অনেক অনেক দূরে ডমরু বেজে চলেছে যেন!

ভয় আর আতঙ্ক জাগিয়ে ঐ ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ শব্দটা মানুষকে কেমন যেন দিশাহারা করে। মন ভেঙে দেয়, মাথা অকেজো করে। পাড়ায় পাড়ায় ঢেঁড়া পিটছে জল-পুলিসের লোক। মৃত্যুর পরোয়ানা শুনিয়ে চলেছে যেন। এক নাগাড়ে বাজতে বাজতে হঠাৎ থেমে যায়। খানিক পরেই আবার শুরু হয় নতুন উদ্যমে। নিরেট অন্ধকারে ঢাকা অদৃশ্য দূর-দিগন্তে ঢোলকের প্রতিধ্বনি ভেসে ভেসে বেড়ায়। দক্ষিণ বাঙলার নদনদী জামীরা, মাতলা, রায়মঙ্গল, মালঞ্চ আর হরিণঘাটার জল চিরদিনের বিচ্ছেদ ভুলে আজ একাধারে যেন একাকার। সীমারেখা আর ব্যবধান ঘুচে গেছে। যুগ যুগ বিরহের পর মিলনলীলায় মেতে উঠেছে যেন, নির্লজ্জের

মত। জল-কল্লোলের হাসাহাসি আর ঢলাঢলিতে এক একটা গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতল জলে তলিয়ে যায় ঘর-বসতি। শুধু দাঁড়িয়ে আছে আকাশছোঁয়া মহীরুহ, বনস্পতি। তাল, নারকেল, খেজুর আর সুপুরী গাছের গোড়া আলগা হয়েছে জলে তুফানে। বেঁকে গেছে, হেলে পড়েছে, নুইয়ে প'ড়েছে জলের বুকে।

ঢেঁড়া পেটার বিশ্রী শব্দ মধ্যে মধ্যে স্পষ্টতর হয়। বৃষ্টিধারার একটানা ঝমাঝম নাচের ছন্দসুর ছাপিয়ে ঢোলকের বাড়ি শোনা যায়। জলের বেগ আর গতি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ক্ষণে ক্ষণে জল যেন উর্ধ্বপানে মাথা তুলছে। ফেঁপে ফুলে উঠছে। সকালে ছিল হাঁটুভতি, এখন হয়তো কোমরে উঠেছে। এলোমেলো বাতাস বইছে সোঁ সোঁ। হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া চলেছে থেকে থেকে। জল, মাটি আর বাতাসে যেন ফিসফিস কথা বলাবলি করছে পরস্পরে। ষড়যন্ত্রের শলা-পরামর্শ চালিয়েছে।

আকাশ-প্রান্তে আবার আলোর ঝিলিক দেখা যায়। কাঁপা কাঁপা বিদ্যুতের চমকানি। থামতে চায় না। রসুইশালের মুক্ত কপাট থেকে রাণীর ছলছল চোখে ক্ষণেক ধরা পড়ে আকাশ আর মাটি। বর্ষণসিক্ত কালো মাটি আর ঘন কৃষ্ণমূর্তি আকাশ। গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের মোহনা থেকে চাপ চাপ কাজলের মত খণ্ডমেঘের দল ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে এখনও। সাঁঝোয়া বাহিনী আসছে যেন, কামান দাগতে দাগতে। আসছে যেন সাম্রাজ্যের লোভে! মেঘে মেঘে ঘর্ষণের বজ্রধ্বনি, গুমরে গুমরে উঠছে।

বাজ পড়লো আবার। কড় কড় কড় কড়! বাজের বিকট শব্দ মহাশূন্যে ছোটাছুটি করছে কি এক আক্রোশে। আকাশ-মঞ্চে বিজলীর প্রলয় নাচন দেখা যায়। বৃষ্টির দাপট এখন কম না বেশী ঠাওরানো যায় না ঠিক।

উনুনে কাঁচা কাঠ জ্বলছে দাউ দাউ। চুল্লীতে জল-ভর্তি হাঁড়ী চাপিয়ে দিয়েছে রাণী। মুরগীর মাংস সেদ্ধ হচ্ছে। গন্ধ ছড়িয়েছে মাতাল বাতাসে। অপঘাতে বা দুর্ঘটনায় মরেছে কালীচরণ। ভয়ের শিহর রাণীর নরম শরীরে। কপালের দুই তীর অসহ কষ্টে টনটনিয়ে উঠছে। জলজ্যান্ত মানুষটা, গেল যখন চিরকালের মতই গেল। কিছুতেই ভাবতে পারছে না রাণী, অবিশ্বাস্য ঠেকছে। মনের কোন্ গোপন কোণে এখনও আশা জাগে, হয়তো যা শুনেছে তা সত্যি নয়। কালীচরণ আছে, বেঁচে আছে। বহাল তবিয়তেই আছে। প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে কখন হয়তো হঠাৎ এসে হাজির হবে। এক মুঠো টাকা আনবে সঙ্গে। মরণভীরু পারাপারের যাত্রীদের লুটিয়ে দেওয়া টাকা এক রাশি। দু'চার টুকরো কুঁচো সোনা।

কিন্তু সত্যি সত্যিই আর যদি না ফেরে কালীচরণ! কতকাল অপেক্ষায় দিন গুণবে রাণী? চিন্তা আর ভাবনার জটলায় মাথাটা যেন রাণীর বিগড়ে গেছে। ভাবতে পারছে না। ভাবনায় মিল থাকছে না। উনুন থেকে একখানা জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিয়ে পরনের স্যাঁত স্যাঁতে ছিন্নবাসে আগুন ধরিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় যেন। যে যতই আশা দিক, আলো দেখাক অন্ধকারে,—রাণীর আর বাঁচতে সাধ হয় না এক দণ্ড।

বাচ্ছাগুলো কোথায়? ইদিক সিদিক চোখ ফেরায় রাণী। জল থৈ থৈ চোখ। এই দুর্যোগের রাতে কেউ যদি কোথাও ঠিকরে বেরিয়ে যায়, সেই ভাবনায় মনটা অস্থির হয়। কোথায় গেল তারা। রাণী উঠে পড়লো, চোখ দুটো মুছলো ভিজে আঁচলে। শিয়াল আর হায়নার ভয় আছে এ তল্লাটে। কোলের বাচ্ছাটাকে চুরি করে যদি সন্তর্পণে এসে! কান্নাকাটির অবকাশ থাকবে না, চেঁচাতে দেবে

না। কচ্ছিশিশুর টুঁটিতে কামড় দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে শিকারসমেত। তারপর ?

গা ছম ছম করছে রাণীর। আতঙ্কে যেন কণ্ঠরোধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বুকে পিঠে কাপড় জড়িয়ে, আ-কপাল ঘোমটা টেনে রাণী পা টিপে টিপে এগোয় ঘরের দিকে। উনুনের আগুনের আলোয় নিজের ছায়া দেখে চমকে ওঠে একবার। বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো একটা।

ঘরের এক কোণে মিট মিট দীপ জ্বলছে।

ছেঁড়া-মাদুর বিছানো শয্যায় রাণীর এক গণ্ডা বাচ্ছা জড়াজড়ি শুয়ে আছে। ভয়ে ভয়ে আঁকড়ে ধরে আছে একে অন্যকে। ঘুমে কাতর, তবুও মুখে মুখে ভয়ের ছায়া। নেহাৎ শিশুটা শুধু যেন, নির্ভীক নিশ্চিন্ত! শোকের জ্বালা নেই তার মুখাবয়বে। বরং একটু হাসির প্রলেপ তার ছোট্ট ঠোঁটে। দেয়ালার হাসির মত।

বাদলের রাত। ক্লান্তিবিহীন জল ঝরছে আকাশ-ঝর্ণা থেকে। ঠাণ্ডা বাতাস চলেছে সোঁ সোঁ। আর একটা শ্বাস পড়লো, স্বস্তির শ্বাস। চোখের সমুখে বাচ্ছাদের দেখতে পেয়ে রাণী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। দু'খানা কাঁথায় ঘুমন্ত চারজনকে ঢাকা দিয়ে দেয় রাণী। তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত। জলো হাওয়ায় তারা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

বাইরের দাওয়া থেকে ছাড়া ছাড়া কথা ভেসে আসছে। চৌধুরী, জোসেফ আর লক্ষ্মণ সামন্ত কথা বলছে। ঘরের চালায় বর্ষানৃত্যের ছন্দহীন তাল পড়ছে দিবারাত্রি সারাক্ষণ। কথা তাই স্পষ্ট শোনা যায় না। কান পেতে থাকে রাণী, তবুও শুনতে পায় না। কালী-চরণের খোঁজ আসে যদি। যা জেনেছে তা যদি মিথ্যা হয়ে যায়! হতাশ হাসি ফুটলো রাণীর ওষ্ঠপ্রান্তে। হতভাগ্য নিজের প্রতি ব্যঙ্গের হাসি হাসলো যেন।

শিয়াল ডাকছে কাছাকাছি কোথায়। প্রথম প্রহরের ডাক ডাকছে দল বেঁধে। রাণী আবার রসুইশালে চললো অন্যমনে। পা চলছে না যেন আর। অবশ অঙ্গ বইছে না আর। গমভাঙা ময়দা মাখতে হবে এখন। তিন তিনটে জোয়ানের খাওয়া। দিস্তে দিস্তে রুটি চাই। মাখতে হবে, ঠেসতে হবে, সেঁকতে হবে একই হাতে।

চাতালে আর ঘরের আশেপাশে বৃষ্টির জলে নকল ডোবার সৃষ্টি হয়েছে। স্থল দেখা যায় না, শুধু জল আর জল। পায়ে-চলা-পথ আত্মগোপন করেছে জলের আবর্তে। রসুইঘরের কপাটের ফাঁক থেকে রাণীর চোখে ধরা পড়ে বাইরের ছবি। অবিচ্ছেদ্য আঁধার যখন বিজলীর আলোয় ভেঙে খান খান হয় তখন। বিদ্যুৎ মিলিয়ে যায় আপন শক্তি হারিয়ে। আবার সেই জমাট অন্ধকার। রহস্য-ময় ভয়াল তমসায় লুকিয়ে পড়ে রাতের প্রকৃতি। রসুইঘরের পেছন দিকে ব্যাঙ্ ডাকাডাকি করছে অনর্গল। এক-আধটা নয়, অনেকগুলো।

ময়দা ঠেসতে ঠেসতে রাণী কেমন যেন নিথর হয়ে থাকে। আনমনা রাণীর চোখে পলক পড়ে না। ফ্যালফ্যাল চাউনি। উনুনের জ্বলন্ত আঁচে চোখ রেখে ব'সে আছে স্থাণুর মত। কড়-কড়িয়ে মেঘ ডাকতেই আবার কাজে মন দেয়। কোন্ এক স্বপ্ন-লোক থেকে ফিরে আসে যেন তার সত্তা। স্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন কে জানে!

ঠিক এই সময়ে, সন্ধ্যা উৎরোলেই কালীচরণ ঘাট থেকে ফিরে আসতো। দাওয়ায় পা দিতে না দিতে ডাক পাড়তো রাণীকে। যতক্ষণ না চোখের সামনে বেরিয়ে দেখা দিতো রাণী ততক্ষণ ডাকা-ডাকি করতো। বৌকে দেখলেই কালীচরণের কর্মক্লান্ত মুখে হাসি

ফুটে উঠতো অনাবিল। রাণীকে একেবারে দুই বাহুর মধ্যে ধ'রে রাখতো কতক্ষণ। চুমুতে চুমুতে রাণীর মুখখানি ভরিয়ে দিয়ে তারপর মুক্তি। বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়েও লজ্জার অন্ত থাকতো না।

সেই ডাক থেকে থেকে কানে ভাসছে আজ। সেই অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর, যেন ডেকে ফিরছে কোথায় কোন্ গহন আঁধারে। গা ছম ছম করছে রাণীর।

—রাণীবৌ!

কেমন যেন ভাঙা কাঁসরের সুর চৌধুরীর কথায়। জলে ভিজে ভিজে হয়তো গলা ভেঙে গেছে। কিম্বা দু'চার পাত্র চোলাই-জলে অন্য সুর ফুটেছে। যেমন ভারী, তেমন গম্ভীর।

মাথায় ঘোমটা টানলো রাণী। সীঁথি ঢাকলো যেন সলজ্জায়। তবুও এখনও সিঁদুরের তৈলাক্ত রেখা জ্বল জ্বল করছে, উনুনের গমগমে আঁচে।

চৌধুরী অনুযোগের সুরে কথা বলে। নিজের টলটল দেহটা কপাট ধ'রে সামলায়। ভাঙা গলায় বলে,—মন-মেজাজ ভাল নাই, কাজকর্ম চুকিয়ে লে না বৌ।

ক্ষীণ হাস্যরেখা স্বভাবসুলভ। ম্লান হাসি দেখা দিয়ে ক্ষণিকের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায়। রাণী কথা বলে না। নিশ্চুপ থাকে যেমনকার তেমনি। উনুন থেকে হাঁড়ি নামিয়ে রেখে চাটু চাপিয়ে দেয়।

গন্ধে মালুম পাওয়া যায় মাংস সিদ্ধ হয়েছে, জল ম'রেছে। এক এক মুঠি লবণ, লঙ্কা, হলুদ, দু'এক পলা সরষের তেল হাঁড়িতে

ছড়িয়ে দেয় রাণী। এক এক দফার কাজ এক এক পলকে সেরে নেয় যেন। ফাটল-ধরা কাঠের চাকি আর বেলুন টেনে নেয় হাতের নাগালে। ঠাসা ময়দা থেকে এক তাল তুলে নিয়ে পাকাতে পাকাতে বলে,—রুটি ক'খানা সেঁকে লিই।

হিমঠাণ্ডা বাতাস চলেছে সোঁ সোঁ। চৌধুরী কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়েছে। চোখ দু'টো তার কামরাঙার মত রাঙিয়ে উঠেছে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহটা দুই পায়ের ভরে যেন সোজা থাকতে পারে না অধিকক্ষণ। চৌধুরী আক্ষেপের সুরে বললে,—আমার কেমন সরম লাগছে, হামাগোর লেগে বৌ তুই অহেতুক কষ্ট করবি কেনে? দুটি দুটি মুড়ি-কড়াই পেলেই রাতটুকু কেটে যায়। বিদেয় হয়ে যাই যার যার কাজে।

রুক্ষকেশ এক রাশ। আলগা খোঁপা কখন লুটিয়ে পড়েছে পিঠে। ক্ষীণকোমর ছাপিয়ে নেমেছে। এপাশে ওপাশে মাথা দোলায় রাণী। স্বল্প হাসির সঙ্গে বললে,—আমার আর কেউ নাই। রইলো না, ভাগ্যে সইলো না। তোমরা আছো আমার, সেই ভরসায় এখনও বেঁচে আছি। তোমাদের লেগে একটুক কষ্ট যদি পাই, ক্ষতি নাই কিছু।

—যা বলেছিস রাণীবৌ। আমরা যখন আছি তোর ভাবনাটা কি? কথা বলতে বলতে চৌধুরী মাথায় হাত রাখলো রাণীর। রুখু রুখু চুল এক রাশ, কালো পশমের মত।

আবার মাথা দোলায় রাণী। কান্না-ভরা থমথমে মুখখানি তুলে ধরে। লালাভ চোখে এখনও জল চিক চিক করছে। চোখের তলে কালির রেখা প'ড়েছে। মুখে যেন হদিস-না-মেলা বৃথাচিন্তার ম্লানচিহ্ন। ঈষৎ হাসি ফুটলো মুখে। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে,—ভাবনা তো নাই, তোমরা আছো যখন।

দুই হাতে রাণীকে বুকে তুলে নিতে পারলে হয়তো চৌধুরীর আনন্দের প্রকাশ যথারূপ পায়। এই ক'দিন ক'রাত্রে কত ভেসে-যাওয়া, ডুবে যাওয়া মেয়েদের নিজের হাতে উদ্ধার ক'রেছে চৌধুরী। পাঁচ সাতখানা গ্রামের কত যুবতীবধুকে ডুবুডুবু ঘরের মধ্যে থেকে রক্ষা করেছে বিনা মৃত্যুভয়ে। তেমনি রাণীকে যদি বুকে তুলে নিয়ে খানিক ধরে রাখতে পারতো তবেই হয়তো চৌধুরীর আশা মিটতো।

এধার সেধার দেখলো চৌধুরী। চতুর্দিকে অন্ধকার। বাইরে যেন বৃষ্টির লহরা চলেছে। দ্রুত লয়ের ধারাবর্ষণ। গুরু গুরু মেঘগর্জন। বিদ্যুতের কাঁপনে থেকে থেকে আঁধার যবনিকা হেসে হেসে ওঠে। ব্যাঙ ডাকছে জলা-ডোবায়। উদ্দাম-গতি জলপ্রবাহ কুল-ছাপানো নদীতে। পাহাড়ী ঝর্ণা যেন ছুটে চলেছে—সমুদ্রের মত গর্জে গর্জে ছুটছে।

জলের গর্জন অনেক দূর থেকে এখানেও ভেসে আসে ঝড়-বাতাসে। উড়োজাহাজ উড়ে চলেছে যেন। প্রপেলার ঘুরছে অনেক, এক সঙ্গে। বোমারু বিমানবহর দলে দলে যেন কোথায় পাড়ি জমায়। আকাশের কড় কড় ডাক শোনায় যেন বোমাবর্ষণের সুর।

আবার একবার দেখলো চৌধুরী। লক্ষ্য করলো নেশায় লাল চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। টলটল দেহটা সামলে রাখতে হয় যেন অতি চেষ্টায়। চৌধুরী সত্যিই রাণীর মুক্ত দুই কাঁকালে দুই হাতের ছোঁয়া রাখে। নিখুঁত গঠন নাকি রাণীর, নধর নরম।

অবাধ্য আঁচল পিঠে-কোমরে টানাটানি করে রাণী। করুণ আর ক্লান্ত মুখখানিতে আধ-ফোটা হাসি থমকে থাকে। রাণী ফিসফিসিয়ে শুধোয়,—হ্যাঁগো, বাচ্ছা ক'টা অনাহারে মরবে না তো?

—যতক্ষণ আমাগোর ধড়ে জান আছে ততক্ষণ লয়। চৌধুরীর জল-ঠাণ্ডা দুই হাত রাণীর দুই কাঁকালে, সাপের চাঞ্চল্যে ঘোরা ফেরা করে।

খুশীতে না দুঃখে কে জানে সামান্য হাসির আভাষ রাণীর উঁচানো মুখে। চিবুকে আর গালে টোল খেয়েছে অস্ফুট। রাণী নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকে কতক্ষণ। কড়াকাঠের হাল আর দাঁড় ধরা হাত জেলে-মাঝি চৌধুরীর। হাতের তালু দু'টোতে কড়া আছে কতগুলো, যেন লৌহকঠিন। এক কুসুমকোমল দেহলতা ঐ কঠোর হাতে ধরা পড়েছে আজ। চৌধুরী তবুও সমজে যায়। সজাগ সচেতন হয় মুহূর্তের মধ্যে। বাতাসে দুয়োরের কপাট কোথায় পড়তেই রাণীকে ছেড়ে দিয়ে স'রে দাঁড়ায়।

রাণী ফিস ফিস বললে,—থাক, এখন এ সব থাক। রুটি কখানা সেঁকতে দাও।

হাওয়া চলেছে মত্ত বেগে। দিকের ঠিক নেই। এখান থেকে সেখানে, ওপর থেকে নীচে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ ছোটাছুটি করছে। তীব্র গতি যেন কাদের কানে কানে অমঙ্গলের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে বেড়ায় গুঞ্জরণের সুরে। দূরে না কাছে কোথায় ঢেঁড়া পিটছে না আকাশে মেঘ ডাকছে ঘন ঘন, কে বলবে! হাওয়ার কথা শোনা যায় জলাভূমিতে। পরক্ষণেই গাছের শিখরে শিখরে। ভাষা অবোধ্য, কি যে এত বলতে চায় কে জানে!

ঘরের কোনে কোণে অন্ধকার জমাট বাঁধে আরও। স্তূপীকৃত আলকাতরা যেন। হিমার্ত ঘন আঁধারের রূপ, উনুনের আগুনে যেন আরও ভয়াবহ হয়েছে। হেসে হেসে উঠছে প্রলয়ের কালো রাত্রি।

রসুই থেকে বেরিয়ে যায় চৌধুরী। কত যেন অনিচ্ছায়। অন্ধকারে পা চালায় আন্দাজে। দাওয়ায় তখন জোসেফ আর

লক্ষ্মণ সামন্ত, দড়ির খাটিয়াতে গড়িয়ে পড়েছে আড় হ'য়ে। ব্যথা-মারার ওষুধ খেয়েছে, কয়েক পাত্র চোলাই। আরামের আতিশয্যে নীরব দুজনেই! ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে ধরা যায় না। অঝোরে জল ঝরছে, খেয়াল নেই। বাজ পড়ছে ঘন ঘন।

চৌধুরী খাটিয়ার তলায় হাত চালায় সাবধানে। টলটল শরীর তার, একটা কোথাও আশ্রয় চাইছে। ঠাণ্ডা কলসীটা হাতে ঠেকতেই চাপা হাসি হাসলো চৌধুরী। চোরের মত হাসলো। কলসী মুখে তুলে ধরে। যতটুকু আছে ততটুকুই লাভ। জল খায় যেন চৌধুরী, তৃষ্ণার্তের মত। ঢকঢকিয়ে পান করে মধু না অমৃত।

—সাবধান চৌধুরীভাই! আঁধার কাঁপিয়ে সহসা কথা বললে জোসেফ। তার দৈহিক চাঞ্চল্যে খাটিয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তোলে। জোসেফ আবার বললে,—বেআক্কেলের মত খেয়ে একটা কাণ্ড বাধাবে দেখছি। নিজেকে সামলাতে পারবে তো?

—খু-উ-ব পারবো। মুখ থেকে শূন্য কলসী নামিয়ে জবাব দেয় চৌধুরী। কেমন যেন দাম্ভিক উক্তি তার! কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাসের জোরালো সুর।

—হাল ধরতে পারবে ঠিক ঠিক? জোসেফ প্রশ্ন করে জেরার ধরনে।

—হাঁ হাঁ খু-উ-ব পারবো।

—নিদ্ আসবে না তো?

—উঁহু।

—দিকভুল হবে না?

—না গো না। এত ভয় পাও কেনে?

—লেসাকে আমার বড় ভয় চৌধুরীভাই। লেসা আর জাতকম্ম এক সঙ্গে চলে না। কাজের সময় কাজ। লেসার সময় লেসা!

লক্ষ্মণ সামন্তের চোখের তন্দ্রা মধ্যপথে বিদায় নেয়। কথা বলাবলিতে ব্যাজার হয় সে। বিরক্তির সঙ্গে উঠে বসলো লক্ষ্মণ। চোলাইয়ের প্রতিক্রিয়ায় তার মাথা টলমল করছে। জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বললো সে। বললে,—এমন ঘুমটা মাঠে মারা গেল। দু'জনায় কি যে এত বকবক করছো!

হো হো শব্দে হেসে উঠল চৌধুরী। হাসতে হাসতে বললে,—সামন্তর পো, কাঁচাঘুমটা নষ্ট হয়ে গেছে?

মাটির ধস নামলো জলে। কামান দাগলো কে যেন। ছোটখাটো পাহাড়ের মত খণ্ড খণ্ড মাটির স্তূপ তুফান-আবর্তে পড়ে আর নিশ্চিহ্ন হয়। ধারালো জলের চাপে মাটি কাটছে আর পড়ছে ঝুপঝাপ। সমুদ্রের গর্জন তুলে তীরের বেগে জলের ঢেউগুলো ছুটছে। ফাঁপা ফোলা উর্ধ্বমুখী একটা একটা ঢেউ। যেমন বিশাল বিস্তৃত আকৃতি তেমনি মারমুখী বিধ্বংসী দ্রুতগতি। জলের ডাক নয়তো, উড়োজাহাজ উড়ছে শত শত। বোমারু বিমান উড়ছে রণাঙ্গনের আকাশে। ঝাঁক ঝাঁক বোমা বর্ষণ করছে যথায় তথায়।

চোখ দুটো লক্ষ্মণ রগড়ে নেয় দু'হাতে। ঘুম ছাড়িয়ে নেয় যেন। জড়িত কণ্ঠস্বরে বললে,—চৌধুরী, রাতটা যে কাবার হতে চললো। পারঘাটে যাবে কখন?

অকারণের হাসি। অর্থহীন। চৌধুরীর হো হো অট্টহাসি যেন থামতে চায় না কোন মতে। এই কেমন একটা দোষ তার, পেটে দু'এক পাত্র পড়লেই হাসতে শুরু করে। কেমন অফুরন্ত দিলখোলা নির্ভেজাল হাসি। হাসতে হাসতে চৌধুরী বললে,—মুখের খানা ফেলে যাবি না কি? পারঘাট তোর পালিয়ে যাবে না।

তিনখানা কলাপাতা পড়লো দাওয়ায়। বৃষ্টির জলে ভিজে এখনও। দুয়োরের কাছে পিদিম বসিয়ে দেয় রাণী। সবুজ

কলাপাতা দেখে ক্ষুধাতুর তিনজন হাসি আর কথা থামিয়ে খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। টল টল মূর্তি ক'টির লম্বা আর বাঁকা ছায়া পড়ে ঘরের দেওয়ালে আর দাওয়ায়। দীপশিখা কাঁপছে ধিক ধিক। বাতাসের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে কোন গতিকে জ্বলছে, মরণাপন্ন রোগীর শেষ হৃদ্‌ঘাতের মত ধুকধুক করছে। দপ্‌ করে কখন নিভে যায় তার ঠিক নেই।

মাংসের গরম হাঁড়ী নামিয়ে রাখে রাণী। দাওয়ার ঠিক মধ্যিখানে বসিয়ে দেয়। ধোঁয়া উঠছে হাঁড়ী থেকে। রসুনের গন্ধ ভেসেছে হাওয়ায়। রান্না মাংসের সুগন্ধের প্রলোভন ছড়িয়েছে যেন। রুটির থালা এগিয়ে দেয়। এ্যালমুনিয়ামের তোবড়ানো থালায় দিস্তা দিস্তা রুটি। যে যত পারো খাও। যার যত খুশী।

—অখাদ্যি হয়েছে। ঘোমটার আড়াল থেকে রাণী কথা কইলে কাঁপা কাঁপা সুরে। জলের ঘটি নামিয়ে দিতে দিতে বলে,—তবুও যা হোক মুখে পড়ুক। পিত্তি রক্ষে হোক। আমি কি জানি ছাই কোরমা-কাবাব বানাতে!

জোসেফ পাতা তিনখানা পাশাপাশি পাতে। ক্ষুধায় লোলুপ হয়ে উঠেছে সে। পেটের জ্বালায় অস্থির। জঠরানলে কিছু আহুতি না দেওয়াতক কিছু আর ভাল লাগছে না তার। এমন কি রাণীকেও নয়। জোসেফের লুব্ধ দৃষ্টি রুটি-মাংসে। তর সয় না যেন। খানকয়েক রুটি তুলে নেয় জোসেফ নিজের পাতে। বলে,—রাণীবৌ, মাংসটা তুমিই পাতে পাতে দিয়ে দাও না কেনে!

লক্ষ্মণ সামন্ত বললে,—লাখো কথার এক কথা বলেছে জোসেফ। শেষে কি কাড়াকাড়ি লাগবে। মারামারি বাধবে!

চৌধুরী বললে,—থামো থামো। আগে বৌ তোমার লেগে

কিছু কিছু তুলে লাও। তুমিও খাও আমরাও খাই। তুমি কি উপোষে থাকবে? মরবে?

জোসেফ বললে,—হক কথা বলেছে চৌধুরীভাই। একটা বিবেচনার কথা ব'লেছে। রাণীবৌ যদি না খায় আমরাও—

রাণী তখন ঘরে সিঁদিয়েছে। দুয়োরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কপালে ঘোমটা টেনে। শোকের প্রচ্ছন্ন প্রতিমূর্তি যেন। পোড়া-ভাগ্য। রাণী ফিসফিসিয়ে বললে,—ক্ষুধা তৃষ্ণা আর নাই আমার। মুখে উঠবে না।

হয়তো কথা বলতে বলতে রাণীর চোখ আবার ছলছলিয়ে উঠলো। মুখের কথা কেঁপে কেঁপে উঠলো। একরাশ হিমহাওয়া আসতেই আঁচল জড়ালো বুকে পিঠে। চোখে যেন আঁচল চাপলো। ঘরের মানুষকে মনে পড়ছে হয়তো তার। তার নিজের কালী-চরণকে। সেও মাংসলোলুপ ছিল। রাণীর রান্নার জয়গান গাইতো সুপ্রচুর। লঙ্কা কিম্বা লবণের ভাগ বেশী হয়েছে, তবুও দোষ ধ'রতো না কদাচ। রাণীর হাতে রান্না কাছিমের মাংস কালীচরণের কাছে ছিল পরম উপাদেয়। আজ সে নেই আর। অজানা অন্ধকার রহস্যে আত্মগোপন ক'রেছে। রাণীকে স্রেফ জব্দ করতেই যেন ডুব মেরেছে কালীচরণ। চোখের আড়ালে থেকে দেখছে হয়তো, রাণী হাসছে না কাঁদছে। পরীক্ষা করছে রাণীকে।

—দোহাই রাণীবৌ। গড় করি তোমাকে। মাথার দিব্যি দিই। কথা বলতে বলতে লক্ষ্মণ সামন্ত রাণীর সম্মুখে এগিয়ে যায়। বলে,—দু'খানা রুটি আর এক হাতা মাংস তুমি যদি না খাও—

—থাক, আজ আর নয় লক্ষ্মণ ঠাকুরপো। রাণীর কণ্ঠে কথার গুঞ্জন শোনা যায়। রাণী বললে,—আমি গড় করছি তোমাকে। খাওয়ায় আর রুচি নাই। ব'ল না।

চৌধুরী বললে,—কথা রাখো বৌ, যা বলি শোন'।

রাণী বললে,—জল-বাতাসা খাবো আমি। মুড়ি-মিষ্টি খাবো।

ঘরের চালায় বৃষ্টির নাচানাচি। দাওয়ার নীচে মাটিতে জল-কাদা। কালো মাটিতে থৈ থৈ জলে ব্যাঙ লাফালাফি করছে। রসুইয়ের পেছনে তক্ষক ডাকছে।

. সাঁই সাঁই বাতাসে রাণীর আঁচল বেসামাল হতে চায়। দুয়োরের কপাট ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে একাকিনী নায়িকার মত। বিরহের মলিনতা মুখে। ছল ছল চোখে শূন্য চাউনি।

—জোরজুলুম নাই বা করলে বৌকে। জোসেফ কথা বললে রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে। কথার সুর গম্ভীর। লাল চোখে ক্ষুধার আবেদন ফুটছে। বললে,—যা মন চায় খাবে'খন রাণীবৌ। কথার শেষে খানিক থেমে থাকে জোসেফ। মাতা মেরীকে স্মরণ করে কি না কে জানে। বেশ কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে হঠাৎ মনে পড়লো যেন তার। বললে,—তবে বৌ, মাংসটা তুমিই পাতে পাতে দিয়ে যাও।

লক্ষ্মণ সামন্ত বললে,—আমারও ঐ এক কথা।

মৃদু মৃদু হাসলো রাণী। অগত্যা ঘর থেকে দাওয়ায় বেরিয়ে দেখা দিলো। হাঁড়ী থেকে মাংস ঢেলে দেয় রাণী, পাতায় পাতায় রুটির স্তূপে। ঝোল আর মাংস।

নিবু নিবু পিদিমটা দপ দপ করছে। তেল ফুরিয়েছে প্রায়। আলোর তেমন প্রয়োজন হয় না আর। অন্ধ মানুষও গোগ্রাসে গিলতে পারে আপন হাতে। কথা থেমে যায়। সকলের আগে জোসেফের ডিনার শুরু হয়ে যায়।

রুটি মুখে দিয়েছে জোসেফ। সত্যিই ডেকেছে একবার যীশুকে। মনে মনে ব'লেছে,—'পরমপিতা, রক্ষা কর'।

ঘরে চলে যায় রাণী। বাচ্ছা ক'টার মুখে তেমন কিছু প'ড়লো না। জ্বররোগীর মত বেঘোরে ঘুমিয়ে আছে তারা। দুর্যোগের রাতে ভয়ে ভয়ে ঘুমিয়েছে যেন। দুঃখের রাত্রি এসেছে, জেনেছে হয়তো। জলের গর্জন, আকাশের দানব-চিৎকার, বাতাসের ফিস ফিস কথা, দিকে দিকে কাজলকালো অন্ধকার। এমন ভয়ের রাতে কালীচরণ নেই তার ঘরে। ডাগর ছেলে দুটো ঘুমের ঘোরে থেকে থেকে ফুঁপিয়ে ওঠে। অস্ফুট কান্নায় তাদের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে আছে।

বৃষ্টির চাবুক পড়ছে যেন হাজার হাজার। গাছের পাতা, ঘরের চালায় চাবুকের ঘা পড়ছে জোরালো বর্ষায়।

রাত্রির স্তব্ধতায় দূরের হাহাকার ভেসে আসে। নয়া সড়কের মিছিল চলেছে আবার। পলাতকের দল চলেছে মৃত্যুর ভয়ে। বন্যায় আহত মানুষ চলেছে কষ্টে কাতর ডাকতে ডাকতে। গ্রাম থেকে শহরের দিকে চলেছে মিছিলটা। শিশু কাঁদছে মায়ের বুকে। গোযানে বুড়ো বুড়ী চলেছে। প্রসূতিও আছে।

শহর কিনারে খোলা মাঠে কুঁচো কুঁচো ছাউনি পড়েছে চার খুঁটের। কাতারে কাতারে নারী পুরুষ শিশু। বাস্তুহারা জনতা। আশ্রয়ের আশায়, জীবনের আকাঙ্খায় বাঁচতে চায়। সাধ আহ্লাদ আছে এখনও, ঘর বাঁধতে চায় আবার। মরতে চায় না। পৃথিবীকে ত্যাগ করতে চায় না এত তাড়াতাড়ি। বসুন্ধরাকে ভোগ করতে চায়।

রসুই ঘরের দুয়োরে শিকলি তুলে দেয় রাণী। আধপোড়া খানকয়েক কাঠে জল ঢেলে উনুন নিভিয়ে দিয়েছে। নিশীথ আঁধারে নিথর দাঁড়িয়ে থাকে রাণী। একেবারে একা, কেউ নেই এখন এ তল্লাটে। বৃষ্টিঝরা আকাশে চোখ মেলে আছে রাণী। কি

এক প্রতীক্ষায় যেন আকুল সে। প্রতিক্ষণে আশায় আশায় থাকে। ভগবান যদি কৃপা করেন এখনও। মুখ তুলে চান।

বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠে মধ্যাকাশে। গুরু গুরু মেঘ ডাকলো আবার। মর্টার না মেসিনগান দাগলো যেন। আকাশে ঘন ঘন আলোর শিহর দেখে ঘরে ঢোকে রাণী। বাচ্ছাদের পাশে ব'সে পড়ে জবুথবু হয়ে। বুকের কাছে ঘুমন্ত শিশুটাকে টেনে নেয়। শোকতপ্ত ক্লান্ত দেহ, রাণী যেন সোজা আর বসতে পারছে না। কোমর কাঁকালে ব্যথা ধ'রে আছে। চোখ দুটো জ্বলছে। ঘুম নামছে চোখে। ক্লান্তি আর তন্দ্রায় ঢুলছে রাণী।

বাইরের দাওয়ায় ছেঁড়া ছেঁড়া কথা। বর্ষাধারায় স্পষ্ট শোনা যায় না। চৌধুরী, জোসেফ আর লক্ষ্মণ সামন্ত—তিনজনে খেতে খেতে হাসাহাসি করছে। উগ্র নেশায় ভুলে গেছে যেন কালীচরণের বিয়োগ ব্যথা। কি এক উৎসবে যেন মেতে উঠছে।

চিন্তায় ছেদ পড়ে যখন তখন। স্মৃতি ওলট-পালট হয়ে যায়। আপন সত্তা যেন ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে রাণী। শরীরটা কেমন অবাধ্যের মত গড়িয়ে পড়তে চায় মাটিতে। একটা ঘুম দিতে পারলে এখন সকল কষ্টের লাঘব হয়। কিন্তু মনটা যেন হুহু করছে সদাক্ষণ। অসহ এক জ্বালায় জ্বলছে।

হাসি আর টুকরো টুকরো কথা কখন থেমে যায় জানতে পারে না রাণী। তন্দ্রার আবেগে আর সোজা ব'সে থাকতে পারলো না। গভীর নিদ্রায় ডুবে গেছে সে। শিশুটাকে বুকে চেপে ঘুমিয়ে প'ড়েছে।

চৌধুরী আর লক্ষ্মণ সামন্ত রাত্রি একটু গভীর হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে পারঘাটের উদ্দেশ্যে। মাথায় টোকা দিয়ে যাত্রা ক'রেছে। মকরবাহিনী গঙ্গাকে মনে মনে প্রণাম জানিয়েছে

যাওয়ার আগে। বিপদ-আপদের কথা কে বলতে পারে! কালী-চরণের রহস্যময় অন্তর্ধানের পর থেকে জেলে আর মাঝিদের মনে বড় ভয়। কার ভাগ্যে কখন কি আছে, কেউ বলতে পারে!

কাঁচা ঘুম ভেঙে যায় রাণীর। বারবার মনে হয় কে যেন দুয়োরের কড়া ধ'রে নাড়ানাড়ি করছে। এক আধবার ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সেছে রাণী। কিন্তু বৃথাই আশা। শেষ পর্যন্ত কারও ডাক কানে আসে না। কেউ ডাকে না রাণীর নাম।

—বৌ! কানের কাছে চাপা কণ্ঠস্বর। রাণী সজাগ চঞ্চল হয়। ডাক শুনে চোখ মেলে তাকায় গভীর অন্ধকার ঘরে, কিছুই নজরে পড়ে না।

ঘরের চালায় চাবুকের ঘা পড়ছে হাজার হাজার। রাত ঘন হওয়ার সঙ্গে বর্ষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে হয়তো। কড় কড় কড় কড় মেঘ ডাকছে, যেন কত কাছে নেমে এসেছে আকাশ। ঝড়ের বাতাস বইছে সোঁ সোঁ।

—বৌ! রাণীবৌ! সাপের মত হিস হিস কথা বলে কে। রাণীর কানের কাছে। চুপি চুপি কথা।

—কে? চমকে চমকে সাড়া দেয় রাণী। শুষ্ক কণ্ঠ তার। বলে,—কি গো? ডাকছো কেন?

—আয় উঠে আয়। লক্ষ্মীটি। জোসেফের মত কড়া আর কঠোর প্রকৃতির মানুষের কথার সুর কত নরম আর মোলায়েম। জোসেফ খুঁজে খুঁজে রাণীর একখানি হাত নিজের মুঠোয় ধ'রেছে।

—কমনে যাবো এই গহিন রাতে? রাণী কথা বলে গুন গুন। বলে,—তোমার কি ঘুম আসে নাই?

—না গো না। আয় আমার সঙ্গে। জোসেফের কথায় কাকুতি-মিনতি।

শিশুকে বুক থেকে নামিয়ে ধীরে ধীরে উঠে ব'সলো রাণী। ফিসফিসিয়ে বললে,—লক্ষ্মণ ঠাকুরপো কোথায়? চৌধুরীভাই?

—পারঘাটে চ'লে গেছে। জোসেফ বললে রাণীর হাতে হাত রেখে।

—তুমি যাও নাই?

—না গো! তোমাকে তবে কে আগলাবে! আমাকে পাহারা বসিয়ে গেছে। কথার শেষে জোসেফ রাণীর হাত ধ'রে টান দেয়। রাণীকে টেনে উঠিয়ে নেয়। দুই বাহুর বন্ধনে তাকে বন্দী ক'রে রাখে যেন। শীতার্ত ঠাণ্ডা নরম দেহ, জোসেফের বজ্র-মুঠোয় ধরা পড়েছে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে জোসেফ। কেমন হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে উঠছে।

নিষেধের মিনতি রাণীর মুখে। গুঞ্জনের সুর। জোসেফের বিশাল বক্ষে মুখ লুকিয়ে রাণী বললে,—না না।

কথায় কান দেয় না জোসেফ। রাণীকে বুকে তুলে নেয়। তারপর দুয়োরের কপাট খুলে ঘরেব বাইরে বেরিয়ে যায় চুপি সাড়ে। যেন চুরি ক'রেছে জোসেফ, এমনই ভয়। তার মুখ থেকে উগ্র গন্ধ পাওয়া যায়, চোলাই মদ আর রশুনের। উত্তপ্ত শ্বাসের হাওয়া লাগে রাণীর কপালে।

—আমার কাছে থাকো কেনে দু'দণ্ড। জোসেফ যেন চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছে। অন্ধকার দাওয়ায় একজন অন্যজনকে দেখতে পায় না। জোসেফ বলে,—কতদিনের সাধ আমার।

লজ্জায় মাথা নত করে রাণী। জোসেফের ছাতিতে মুখখানি লুকায়। বক্ষ যেন দুরু দুরু করে তার। হাত পা হিম হয়ে যায়। মুখে কথা সরে না।

আবেগ আর উত্তেজনা জোসেফের মত মানুষকেও উন্মাদ করে।

গায়ে যে বৃষ্টির ছাঁট আসছে খেয়াল নেই। রাণীর শান্ত মুখে জলের রেণু লাগছে। পর পর কয়েকবার বিদ্যুৎ চমকালো পশ্চিমাকাশে। সেই অল্পক্ষণের আলোয় জোসেফ সাগ্রহে দেখছে রাণীকে। তার মুখখানি। কালো ভ্রমর চোখ। রুখু কেশের রাশি মাথায়, বাতাসে উড়ছে।

কড়কড়িয়ে আকাশ গর্জে উঠতেই জোসেফকে সভয়ে জড়িয়ে ধরে রাণী। কুমারী কিশোরীর মত থেকে থেকে ভয় পায়। শিউরে শিউরে ওঠে। চাপা আনন্দের হাসি লুকায় জোসেফ। বিজলীর ক্ষণপ্রকাশ আলোয় রাণীর দেহরূপ দেখতে দেখতে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে যেন। লজ্জায় চোখ দু'টিতে হাত চেপেছে রাণী।

আরও একটা প্রলয়-রাত্রি শেষ হয়। ঘোলাটে আকাশে আলো ফুটেছে, কিন্তু সূর্যের দেখা মেলে না। জল ঝরছে ভোরের আকাশ থেকে। শীত শীত হাওয়া চলেছে।

চোখ মেলতেই রাণী উঠে পড়লো। কালো রাত্রি নেই আর। শুভ্রতা ছড়িয়েছে। লজ্জার অন্ত থাকতো না, যদি কারও চোখে প'ড়তো। পাশেই জোসেফ, অকাতরে ঘুমোচ্ছে। রাণী উঠে দাঁড়ালো। ইদিক-সিদিক দেখে ঘরে পালিয়ে গেল উড়ো পাখীর মত। চোখে আঁচল চাপলো লজ্জা না অনুশোচনায়। বাচ্চাগুলো এখনও ঘুমিয়ে আছে। দুয়োরের কপাট ভেজিয়ে দেয় রাণী। বাতাস আসছে জলভেজা। শীত শীত করছে।

পা দু'টো ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। কাহিল লাগছে নিজেকে। রাণী ঠায় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না যেন কাঠের পুতুলের মত। সাদা আকাশ দেখে, লুকানো সূর্যের আলোর আভাস দেখে রাণীর

বুক আবার গুমরে ওঠে। হারানো মানুষটাকে মনে পড়ে। কোথায় যে গেল পরম নিষ্ঠুরের মত। অসুস্থ হয় লোকে, রোগে ব্যাধিতে ভুগে ভুগে একদিন চলে যায় মায়ার বাঁধন থেকে। কিন্তু জলজ্যান্ত সুস্থ সবল মানুষটা গেল তো গেল, আর ফিরলো না।

জলের ডাক না ঐ নয়া সড়কের মিছিলের আর্তনাদ, কে জানে। আবার সেই অসহ শ্রুতিকটু হাহাকার ভেসে আসছে। বন্ধ দুয়োর, তবুও রাণীর কর্ণকুহরে পৌঁছায় কেমন একটা ভয়ার্ত ঐকধ্বনি। ব্যাধিবিধ্বস্ত গ্রামবাসীর কান্না।

বাচ্ছাগুলোর পাশে রাণী শুয়ে প'ড়লো আবার। শিশুটাকে বুকের কাছে টেনে নেয়। চাপা কান্নার ফোঁসফোঁসানি ভাসে ঘরে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আবার কাঁদছে রাণী। ডুগরে উঠছে থেকে থেকে।

দূর-আকাশে উড়োজাহাজ উড়ছে। জলের গর্জন, যেন প্রপেলার ঘুরছে। পাহাড়প্রমাণ জল-কল্লোল ছুটছে দুরন্ত বেগে। গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের মোহনা থেকে কালো কালো খণ্ডমেঘ উড়ে আসছে আজও।

বর্ষাভীরু পিপীলিকার সারি চলেছে যেন ছুটতে ছুটতে। শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে মানুষ পালিয়ে চলেছে মৃত্যুর ভয়ে। থাক, ছেড়ে আসা ভিটে পেছনে প'ড়ে থাক। ঘরের প্রতি মায়া-মমতা নেই কারও, সাজানো-গোজানো সংসারে আর আসক্তি নেই। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, কখন ঘরের চালা ভেঙে পড়বে কেউ বলতে পারে না। ভিৎ টলবে কখন কেউ জানে না। নয়া সড়কের মিছিল থেকে কান্না আর আর্তনাদের আকাশফাটা হাহাকার ভেসে যায় কত দূরে। কচি কচি শিশুদের ভীত চকিত কাঁদুনি ভাসে বাতাসে। অনেকগুলি চিল, একসঙ্গে ডেকে চলেছে যেন।

ভোরের আকাশ নয়তো যেন সন্ধ্যার ম্লান ছায়া ঘনিয়েছে দিকে

দিকে। কোথায় যে লুকিয়েছে সূর্য কেউ বলতে পারে না। গত কয়েক দিন ধ'রেই এই লুকোচুরির পালা চলেছে। আলো-আঁধারি লেগেই আছে। এত জলবৃষ্টিতেও বুঝি বা পৃথিবীর তৃষ্ণা মিটতে চায় না।

ঘুমের জড়তায় কখন একেবারে আচ্ছন্ন হয়েছে রাণী। কেমন যেন মরার মত ঘুমিয়ে আছে সে। দেহে প্রাণ আছে কি নেই সন্দেহ হয়। শিশুটাকে জড়িয়ে ধ'রে আছে হারানোর ভয়ে। এত ঘুমেও আঁকড়ে আছে ছেলেকে। গুরু গুরু মেঘ ডাকছে খেয়াল নেই। জলের গর্জন এখন আর কানে যায় না।

হাওয়া আসছে ঘরে, মুক্ত জানালা থেকে। অর্গল নেই, তাই কখন খুলে গেছে দোহাট। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে থেকে থেকে শিউরে ওঠে ঘুমন্ত রাণী। এমন দুর্যোগের দিনে কালীচরণ কাছে থাকলে একখানা ফেঁসে যাওয়া মোটা চাদরে বৌয়ের আপাদকণ্ঠ ঢাকা দিয়ে দিতো। ঘুমের ঘোরে রাণী একবার চোখ মেলে দেখতো। কালীচরণ বলতো,—বৌ আরও খানিক ঘুমো। এত সাততাড়াতাড়ি তোকে আজ আর উঠতে হবে না।

সুখের আর আরামের নিশ্চিন্ত গহন নিদ্রায় ডুবে যেত রাণী, মুখখানিতে সামান্য একটু হাসি ফুটিযে।

ওদিকে দৈনন্দিন অভ্যাসের বশে জোসেফের জমে-ওঠা ঘুমটায় হঠাৎ আপনা থেকেই ছেদ প'ড়লো। ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সলো দুই চোখ কচলাতে কচলাতে। অনেকক্ষণ স্থায়ী একটা হাই তুলে বাসিগলায় দু'বার খক-খক কাসলো জোসেফ। কি এক কর্তব্যের তাড়নায় উঠে দাঁড়ালো সটান। ঘরের চালা থেকে কলের তোড়ে জল ঝরছে। এক আঁজলা জল ধ'রলো জোসেফ। চোখে মুখে ছিটিয়ে ঘুমের আমেজকে স্বেচ্ছায় মেরে দিতে চায় যেন। কপালে

যেন বরফ জলের ছোঁয়া লাগে। গতরাতের নেশা আর উত্তেজনায় জোসেফের গরম মাথাটা যেন ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হ'তে থাকে এতক্ষণে। দাওয়ার মাচা থেকে একটা টোকা টেনে মাথায় চাপিয়ে দিয়ে দাওয়া থেকে ভিজে মাটিতে নেমে প'ড়লো জোসেফ। কি এক কর্তব্যের তাগিদে কোথায় এমন হনহনিয়ে চললো কে জানে।

বৌয়ের কথাগুলি কানে ভাসছে জোসেফের। রাণীর মিষ্টিস্বুরের কথা। একটা একটা কথা যেন জোসেফের স্মৃতির সঙ্গে এক হয়ে গেছে। বৌ ব'লেছিল—ভাত খায় বাচ্ছা ক'টা।

পৃথিবীতে এত শত সুখাদ্য থাকতে কেবল মাত্র দু' মুঠো ভাত! তাতেই যতেক ক্ষুধার জালা মিটে যায় রাণীর সংসারে। ফল মূল মাছ মাংস নয়। ফ্যানসমেত এক এক থালা, স্বর্গের অমৃত-আস্বাদ যার কাছে নগণ্য।

ইষ্টিশানের দিকে পাড়ি জমায় জোসেফ। দীর্ঘ পদক্ষেপে চলতে থাকে। ষ্টেশনের দিকের আবহাওয়া পরখ ক'রতে চলে একবার। প্রলয়ের দিনে তেমন কড়াকড়ি হয়তো আর নেই। রেল-পুলিসের পাহারার চোখে ধূলো দিয়ে কোন রকমে একখানা মালগাড়ীর দুয়োর খুলতে পারলেই যথালাভ। জোসেফ মালগাড়ীর ওয়াগন লুঠতে চলছে। এক বস্তা চাল আড়াইমণের। একটা বস্তা লোপাট ক'রতে পারলেই কাজ চলবে আপাততঃ। রাণীর বাচ্ছাগুলোর মুখে ভাত উঠবে তবে। দুঃখে আর শোকে কাতর বৌয়ের মুখে হয়তো হাসি ফুটবে। কিন্তু ওয়াগনের দরজা খুলে যদি চালের সন্ধান না পাওয়া যায়। তবে শুধু কষ্টই সার হবে জোসেফের। রেল-পুলিসের হাতে ধরা পড়লে আর রেহাই পাওয়া যাবে না কোনমতে। বন্দুকের গুলী খেয়ে আছড়ে প'ড়তে হবে লাইনের ধারে। রেল-পুলিসের হাতে থাকে রাইফেল। বহুদূরের লক্ষ্য ফসকায় না তাই।

পথ-ঘাট এক। জল কাদায় পা সিঁদিয়ে যায় মাটিতে। একটু অন্যমনা হ'লেই পা পিছলে খাল বিলে পড়তে হবে। জোসেফের চলার গতি মন্থর হয়। সাবধানে পথ চলতে হয় তাকে। চৌধুরী কিম্বা লক্ষ্মণ সামন্ত সঙ্গে থাকলে পাহারার ভয়টা এত বেশী প্রকট হ'য়ে উঠতো না। বরং বুকে বল পেত সে। নাম কিনতে চায় জোসেফ হয়তো। রাণীর মুখে হাসি দেখতে চায়। তাই একা একাই চললো জোসেফ। বরাতে কি আছে কে জানে!

বেলা যখন দুপুরের দিকে গড়িয়েছে, তখন একে একে এসে আবার হাজিরা দেয়। লক্ষ্মণ সামন্ত আর চৌধুরী। পারঘাট থেকে ফিরে আসে। লক্ষ্মণের হাতে একটা গোটা মাছ সের তিনেকের। কানকো ধরে আছে লক্ষ্মণ। একটা রুই মাছ, দাওয়ার মাটিতে ধপাস ফেলে দেয়। চৌধুরীর ভিজে কাপড়ের কোঁচড়ে শব্জী। কয়েকটা ঝিঙে আর বেগুন। এক ছড়া কাঁচাকলা। মুঠোখানেক সবুজ-লাল-কাঁচালঙ্কা।

বেড়াল ছানার মত, কালীচরণের জন্ম দেওয়া বাচ্ছাগুলো মাকে ঘিরে চুপচাপ ব'সে আছে। কেমন যেন বিষণ্ন আর বিবর্ণ তারা। দুর্ভিক্ষের আসামীর মত দেখায় যেন। থমথম করছে মুখ, চোখ ফ্যাল-ফ্যাল। রাণীর গালে হাত। চোখ যেন ঘুমন্ত। চোখের পাতা ভিজা।

সত্যি চোখ দু'টিকে কেন কে জানে বন্ধ রেখেছে রাণীবৌ। একটানা ঝড়ঝঞ্ঝা আর যেন ভাল লাগছে না চোখে দেখতে। ঘনঘন বজ্রপাতের শব্দে কানে তালা ধ'রে গেছে।

আশপাশের গ্রামে সারারাত ধরে বন্যার্তদের আকুল চিৎকার আর ভয়ের কান্না। কে বাঁচায়, কে বাঁচে তার ঠিক নেই, শুধু বাঁচাও বাঁচাও রব সকলের কণ্ঠে। নারী আর শিশুদের বুকফাটা আকুলি-বিকুলি।

—একখান কাপড় গামছা যা হয় দাও রাণীবৌ। বড্ড যেনে জাড়া লাগছে আজ। চৌধুরী প্রায় কাঁপতে কাঁপতে কথা বলে। দাওয়ার মাঝে কোঁচড় উজাড় করে। সবুজ সতেজ শব্জীগুলো ছড়িয়ে পড়ে এখানে সেখানে।

দুঃস্বপ্ন দেখছিল যেন রাণী। ডাক শুনে, কথা কানে যেতে আচমকা উঠে প'ড়লো আঁচল সামলে নিয়ে।

—আমাগো একটা ধুতি সাড়ী যা হয় দিস্ বৌ। লক্ষ্মণ সামন্ত দাওয়ার কিনারে দাঁড়িয়ে পরনের বেঢপ ভিজে কাপড়খানার জল সিঁচতে সিঁচতে বলে।

বর্ষা-শীতের তীব্র হিম-জ্বালা গায়ে লাগে না চৌধুরী আর লক্ষ্মণের। গায়ে লাগে না ঠিক নয়, গায়ে মাখে না অর্থের লোভে। কত কত টাকা কামিয়েছে দু'জনে কে জানে। রাতভোর যাত্রী পারাপারে টাকার বদলে কত শত জনের জীবন রক্ষা করেছে তারা। কত মানুষকে বাঁচিয়েছে অব্যর্থ মৃত্যুর কবল থেকে।

—ঠাণ্ডি-জ্বর না ধরে লক্ষ্মণঠাকুরপো। রাণীবৌ ছিন্নবাস ফেলে দেয় দাওয়ায়। কথা বলে ভাঙ্গা গলায়। বললে,—এবার তোমাদের পালা। মরতে চাও বেঘোরে ?

ঝড়ের বাতাস চলেছে এলোমেলো। গাছের ডালপাতা আর পাতা উড়ছে। শীতের দিনের মত ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপুনি লাগছে যেন।

—যা ব'লেছিস বৌ! গায়ে হাতে বেদ্‌না লাগছে আজ। মাথাটা যেন দপদপ করছে।

শুষ্কবাস হাতে তুলে নেয় লক্ষ্মণ সামন্ত। কথা বলতে বলতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় ক্ষণেকের মধ্যে। কাপড় বদলাতে যায় হয়তো। ইঁদারার ধারে-পাশে যায়।

কোথায় খুশী হবে রাণী, টাটকা মাছ আর শব্জী দেখে তা নয়। ব্যাজার হয় যেন। বিরক্তি ফুটে ওঠে ভ্রূযুগলে। চোখে যেন বিরক্তি। থাকতে পারে না, তাই রাণী কথা বলে বীতরাগের সঙ্গে। বলে,—এত মাছ-আনাজ কেন? কি হবে? কে খাবে?

—কেন, তোর বাচ্ছারা খাবে।

— না না ওরা খায় না। মাছ আনাজ মুখে তোলে না তেমন দু'মুঠো ভাত খায়। চালসেদ্ধ।

—ধান চাল কোথায় পাবে তুমি? চৌধুরী ঈষৎ রাগের হাসি হাসলো কথার শেষে। বললে,—এক কুনকে চাল মিলবে না কোথাও।

—তবে না খেয়েই মরুক।

—বিশ্বেস করলি না রাণীবৌ? মনে ভাবলি মিথ্যে ব'লছি?

নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে রাণী। আঁচলের খুঁটে মুখ ঢেকে। জবাব দেয় না একটা। চোখের সমুখে এত সুখাদ্য, তবুও কোন সুরাহা নেই। ক্ষুধা মিটবে না রাণীর উত্তরাধিকারীদের। পেটে দু' মুঠো ভাত না প'ড়লে বাঁচবে না।

—জোসেফ কম্‌নে গেলরে বৌ? আবার কথা বলল চৌধুরী। —দেখি না তো তাকে।

—কুথায় গেছে জানি না। রাণী বলে নিরাসক্ত, বিমর্ষ সুরে।

—আমিও যাবো এখনই। লিজের ঘরে ফিরবো। চৌধুরীও কথা বলতে বলতে চোখের আড়ালে চলে যায়। লক্ষ্মণ সামন্ত যেদিকে গেছে সেই পথ ধরে। ইঁদারার ধারে।

ষ্টেশনের কেবিন-ঘর নজরে পড়ে না দূর থেকে। বৃষ্টির কুয়াশা-

জালে লুকিয়ে আছে লাল ইটের দোতলা ঘর, দেখা যায় না সিগনালের লাল-সবুজ কাঁচ। জোসেফ ভয়ে ভয়ে এক পা এক পা এগিয়ে যায়। মালগাড়ীর সারি লাইন জুড়ে আছে। জোসেফের হাতে লোহার একটা ধারালো শিক। গাড়ীর দুয়োর খোলার চাবি যেন। বুকটা টিপটিপ করছে পাহারাওলার আশঙ্কায়। ওয়াগনের তলায় ঢুকলো জোসেফ। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললো একটা সরীসৃপের মত। মাথার 'পরে গাড়ীর কলকব্জা, নীচে শুধু কাঁকর আর পাথর। হাতের তালু দু'খানা ছিঁড়েকুটে যায়, হাঁটু দুটো ছ'ড়ে যায়, খেয়াল নাই জোসেফের।

হঠাৎ একটা গুলীর আওয়াজ ভাসলো বাতাসে। আবার একটা সঙ্গে সঙ্গে। রাইফেল দাগলো রেল-পুলিস। জোসেফের আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল সাঁই সাঁই।

পিছু ফিরলো জোসেফ। যেপথে এসেছিল ফিরলো তখনই। চারখানা ওয়াগনের তলা পেরিয়ে ছুটতে হবে এখন। মাথায় আঘাত লাগে। হাঁটু থেকে রক্ত ঝরে। হামা দিতে দিতে জোসেফ এগিয়ে যায় যেন তীরের গতিতে। রেল-পুলিসের চোখ এড়াতে পারলো না এত দুর্যোগের সুযোগেও।

লাইন থেকে নেমে একপাশের বুনো রাস্তা ধরলো জোসেফ। বিদ্যুতের ঝলকের মত ছুট দিলো একটা। শিকারীর ভয়ে পলাতক বাঘের মত তীব্র গতি যেন জোসেফের।

গুলী-বারুদের অপচয় করতে চায় না আর রেল-পুলিস। চোর যখন পালিয়েছে, তখন আর কি প্রয়োজন! রেল-পুলিস হাসে আপন মনে, ভীরু চোরের খেলা দেখে।

জোসেফ তখনও ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। ক'বার ছুটতে ছুটতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পিছল কাদায়। পিছু ফিরে তাকায় না আর।

কয়েক পোয়া ভূমি পেরিয়ে তবেই নিরাপদ মাটি থেকে জলে ঝাঁপ দেবে জোসেফ। ডুব-সাঁতারে পালিয়ে যাবে।

কড়কড়িয়ে বাজ ডাকলো উঁচু আকাশে। দূর দিগন্তে বিদ্যুতের ঝিলিক খেললো কেঁপে কেঁপে।

এক বস্তা চালের জন্য জানটা আজ যেতে বসেছিল জোসেফের। চাল চুরির অপরাধ, ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে গুলীবিদ্ধ হ'তে হবে। চাল-চোর জোসেফ থামে না এক পল। পলাতক বাঘ, ছুটছে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে।

সোঁদরবনের বাঘ একটা!

কে কোথায়! কেউ নেই। জনশূন্য চতুর্দিক।

ছোট ছোট ষ্টীমার আর লঞ্চের মত জলগর্ভে মাথা উঁচিয়ে ভেসে রয়েছে। তালপাতার ছাউনি, খড়ের চালা, মাঠকোটা, ইটের ইমারত। এই আছে, এই নেই। চোখের পলকে আবার ভরা-ডুবির মত কখন হঠাৎ ঘূর্ণীআবর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বর্ষামুখর আকাশের কোলে ঘর ভাঙার একটা শব্দ খানিক গুমরে গুমরে ওঠে। ডিনামাইট চার্জ করছে কে যেন। এখানে সেখানে ছড়িয়ে দিয়েছে টাইমবোমা, মাইন। প্রকৃতির ধ্বংসলীলায়, প্রলয়ের তাণ্ডবে অস্থির হয়ে অসহিষ্ণু কারা যেন পোড়ামাটি-নীতির আশ্রয় নিয়েছে। মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণের আগে বিস্ফোরণে ধ্বংস করছে বিলকুল। অস্তি নয়, নাস্তি নাস্তি। কিছু নেই, কিছু থাকবে না। আর কেউ ভোগ করতে পারবে না কখনও। দখল করলেও পোড়া-ফসলের ছাই জুটবে কপালে।

রুক্ষ কেশভার বইতে পারে না যেন রাণীবৌ। বিনি সুতার মালার মত এলো খোঁপা কখন যে আলগা হয়ে পিঠে লুটোপুটি খায় খেয়াল থাকে না। চুলের বোঝা সায়েস্তা হয় না। দাওয়ার এক

কিনারে, বাঁশের খুঁটি ধ'রে কেমন বিষাদ-শান্ত মুখে কার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল রাণীর মূর্তি। হঠাৎ হাওয়ায় আলুথালু চুল ধূমকেতুর পুচ্ছের রূপ পায়। কষ্টক্লিষ্ট রাণীর মুখে বিরক্তি ফুটে উঠলো। ভুরু বাঁকলো ঈষৎ।

। বন্যা-সড়কের জনতার কালো কালো মাথা। তিলতর্পণের অর্ঘদান, মুঠো মুঠো জলাঞ্জলি। দূর থেকে দেখায় যেন কৃষ্ণতিল রাশি রাশি। অবিচ্ছিন্ন মিছিল চলেছে ভীরু মানুষের। গর্ব-উদ্ধত সাহসবিস্তৃত বক্ষ ভেঙে গেছে। দাপট, দর্প, অহংকার ঘুচে গেছে। কামনার প্রতিনিধি, ছাগলের পাল চলেছে যেন। গণগণনার ব্যর্থ সেন্সাস্ চলেছে। মুখে দাবী নেই, স্লোগান নেই।

হাওয়ায় হাওয়ায় ফিসফিস কথার গুঞ্জন। বনবাতাসের ঢেউ আসছে সেই আকাশ ছোঁয়া দিগন্ত থেকে। গাছের কানে কানে কথা বলছে পরিহাসের হাসি হাসতে হাসতে। বাঁশবনে বাঁশীর সুর ভাসছে।

—একখান গামছা দেবে বৌ ?

কোথা থেকে এসে পিছল দাওয়ায় উঠে পড়লো লক্ষ্মণ সামন্ত। কথা বললে ভাঙা কাঁসরের স্বরে। ভিজে বস্ত্র নিঙড়ে জল সেঁচতে সেঁচতে প্রায় ঠক ঠক কাঁপছে লক্ষ্মণ। রাতভোর জল খেয়ে খেয়ে হিমঅঙ্গ কনকন করছে। কাশছে লক্ষ্মণ কথার শেষে। খক খক।

বাতাসের ফিসফিসানি তো নয়, যেন বেঘোরে মরণের আসামীদের চাপা বিক্ষোভ শুনতে পায় রাণী। একটানা বর্ষার ঝমঝম শুনে শুনে কান দুটো এই ক'দিনে অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু তীব্রগতি হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দে যেন ভাষা ফুটছে ফিসফিস। কারা যেন কথা বলাবলি করছে দূরে কাছে। ষড়যন্ত্র চালিয়ে চলেছে প্রতিবেশীর হিংসায়।

একখানি ফেঁসে যাওয়া অতি ম্লান গামছা এগিয়ে দেয় রাণী। ঠিক শুকনো নয়, স্যাঁতস্যাঁত করছে এখনও। চিলের মত ছোঁ মেরে যেন কেড়ে নেয় লক্ষ্মণ সামন্ত। কম্পমান সে। আর যেন জল-বাতাস সহ্য হয় না। যেদিকে ইঁদারা আবার সেদিকে ছুট দেয়। পিছ্‌লে পতনের ভয়ে পা টিপে টিপে ছুটলো।

দাওয়া ছেড়ে ঘরে সিঁদোয় রাণীবৌ। একা একা দাঁড়িয়ে গুরু-গম্ভীর জলগর্জন শুনতে কেমন যেন ভয় হয় তার। বুক ধুকধুক করে। এঘরে সেঘরে এলোপাথাড়ি কি খুঁজতে লেগে যায় কি এক খেয়ালে। ডেও-ঢাকনা, হাঁড়ী-কলসী, চুবড়ি-চ্যাঙারী হাতড়াতে থাকে একের পর এক। এটা সেটা নামিয়ে ফেলে ছড়ায় ঘরের মাটিতে। এক মুঠো চাল, যদি কোথাও মিলে যায় খোঁজাখুঁজিতে। বাচ্ছা ক'টার মুখে দিয়ে ক্ষুধার জ্বালা মেটাবে রাণী। দেখতে দেখতে কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কোথাও মিলছে না হাতড়ে হাতড়ে। এক কণাও না। হায় কপাল! সত্যিই সজোরে একবার কপাল চাপড়ায় রাণী। সংসারের এমনই বাড়ন্ত অবস্থা, চাল নেই এক কুনকে! চঞ্চলা লক্ষ্মী, রুষ্ট অপ্রসন্ন হবেন।

বাচ্ছাদের রূপ আর আকার যা হয়েছে চোখে যেন দেখতে পারে না রাণী! এক এক মুঠো ভাতের অভাবে এই ক'টা দিনেই এক একটার আকৃতি হয়েছে দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত। শীর্ণ জিরজিরে চেহারা, বুকের পাঁজর গোনা যায়। চোখ কোটরে সিঁদিয়েছে। দেখে দেখে শিউরে ওঠে রাণী। ভাবলেও শিউরে ওঠে। ওদের ভাগ্যে কি লেখা আছে কে জানে!

কোথাও কিছু মিললো না। অসহায় রাণী ব'সে পড়লো হতাশায়। চোখ ফেটে জল ঝরলো দু'ফোঁটা।

তবুও কত সুখাদ্য আনতে প্রস্তুত তিন তিনটে জোয়ান। মাছ,

মাংস, শাক-শব্জী, ফলমূল—কিছুতেই কিছু নয়। মন উঠছে না কারও। মুখে রোচে না যেন ভাত ছাড়া কিছুই!

—জোসেফকে দেখি নাইতো। গেল কোথা?

পরনের শাড়ীর এক প্রান্তে মাথা মুছতে মুছতে লক্ষ্মণ সামন্ত শুধোয়।

বাঁধন ছেঁড়া চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল রাণী। দুশ্চিন্তার জালে জড়িয়ে যেন নীরব নিথর হয়েছে। সমস্যার পর সমস্যা। সমাধানের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। ধান-চাল যদি নাই মিলে কিছুকাল এখনও! আর ভাবতে পারে না রাণী। চোখে আঁধার দেখে।

—কথা কও না কেনে বৌ? লক্ষ্মণ একটু যেন বিরক্ত হয়েই বললে দুয়োরের ওধারে থেকে। বললে,—জোসেফ কৈ?

—জানি না। ব'লে যায় নাই কোথাকে গেছে। রাণী কথা বললে ধীর শান্ত কণ্ঠে। যেমনকার তেমনি ব'সে থাকলো। মূর্তি-মতী দুর্ভাবনা যেন।

—দু'টা মুড়ি দাও রাণীবৌ। কথা বলতে বলতে শাড়ীর এক প্রান্ত গায়ে জড়ায় লক্ষ্মণ। শীত শীত করে যেন। শরীরের গাঁটে গাঁটে কনকনানি ধরেছে। লক্ষ্মণ বলে,—দু'টা মুড়ি আর এক ঘটি জল খেয়ে একটা টানা ঘুম দেবো বৌ। পিথিবী রসাতলে যাক্ তবু উঠবো না।

—এবার একটা অসুখবিসুখ হোক আর কি! ক্ষীণ সুরে বললে রাণীবৌ। উঠে দাঁড়িয়ে ঝুলন্ত শিকায় হাত তুললো। কড়ির জারে হাত পুরলো। মুড়ির পাত্রে। আপন মনেই বললে—তেমন আর আছে কি ছাই! বাদলার দিনে হয়তো মিইয়ে গেছে। খেতে পারবে না।

—যা আছে তাই দাও। উপায় কি আর! কথার শেষে হাতের আঁজলা পাতে লক্ষণ সামন্ত। বললে,—জোসেফ গেল কোথায় কে জানে!

এক ঝলক স্বভাবসুলভ হাসি ফুটলো রাণীর বিষন্ন মুখে। মুঠো কয়েক মুড়ি দিয়ে হাসির জের টেনে রাণীবৌ বলে,—জানলে কি আর বলি না! পেত্যয় কর' না কেনে?

কোন জবাব দেয় না লক্ষ্মণ। খক খক কাশে।

মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে। রুক্ষশুষ্ক তৃষ্ণাতুর পৃথিবীর তৃষার আকাঙ্খা চিরতরে মিটিয়ে দিতে চায় বর্ষার আকাশ। আর কোন খেদ রাখবে না, ক্ষোভ থাকবে না।

ষ্টেশনের দিকে পাড়ি দিয়েছিল জোসেফ। উঁচু জমির গড়ানে টিলা ধ'রে হনহনিয়ে এগিয়ে চলেছিল। ঐতো রেল ষ্টেশন! লাল ইটের কেবিনঘর ঝাপসা দেখায় দূর থেকে। জোড়া জোড়া লাইনের কালো সরলরেখা। রেল ষ্টেশন হাতছানি দিয়ে ডাক দেয় যেন জোসেফকে, কি এক প্রলোভনে। চুরি করতে চলেছিল জোসেফ। জানমাল যায় যদি রেল-পুলিসের গুলীতে, সেই ভয়টাই শুধু বার বার প্রকট হ'তে থাকে জোসেফের মনে। লাঠি-সড়কি, ছোরাছুরিকে তত ভয় হয় না, যত ভয় রাইফেলের আওয়াজকে। বড্ড ডরায় জোসেফ। সেবার রাসের মেলায় এক মহাজনের গদীতে মধ্যরাতে সিঁদ কেটেছিল জোসেফের দলবল। বেশীদিনের কথা নয়। নগদ টাকার আণ্ডিল মহাজন দপ্তরে। বামাল সমেত পালিয়ে গেলেও, অক্ষত পালাতে পারলো না। একটা ধারালো

বর্শা এসে প'ড়লো পিঠে। এক বিঘৎ কাটা দাগটা এখনও তার সাক্ষী।

ষ্টেশন যত কাছে আসে জোসেফের দৌড়ের গতি ততই উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল যেন জোসেফ। মুখে তার ক্রুর হাসি। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চোখের দৃষ্টি চলে না। আন্দাজে অনুমানে পা ফেলতে হয়। জোসেফের হাতে একটা ছুঁচালো ধারালো লোহার শিক। সামান্য, কিন্তু জোসেফের হাতে পড়লে মারাত্মক কাজ করে। মানুষের বুকে বিঁধিয়ে দাও, পেট ফাঁসিয়ে দাও। আবার কল-কুলুপ খুলতে চাও তো তাতেও চলবে। নগণ্য একটি শিকেব বহু-ব্যবহার হয়তো শুধু জোসেফই জানে। কোথায় কেমন চালাতে হয়।

সিগন্যাল পোষ্টের নীচে লাল-সবুজ নজরে পড়লো। সবুজ সতেজ প্রকৃতির বুকে বেরসিক লৌহদণ্ড। দুই চোখে যেন দুই রঙ—লাল আর সবুজ। যান্ত্রিক নিশানায় থামা আর যাওয়া। স্থিতি আর গতি।

মালগাড়ীর সারি, শেষ নেই যেন। জোসেফের হাত নিশপিশ কবতে থাকে। গাড়ীর কামবা একের পর এক। লোহা, কয়লা, চুন-বালির গাড়ীর মাথা নেই, দুয়োরের বালাই নেই। বন্ধ আর ঢাকা গাড়ীতে আছে যতেক খাদ্যদ্রব্য। চাল ডাল আটা ইত্যাদি।

মালগাড়ীর তলায় আশ্রয় নেয় জোসেফ। বৃষ্টির তোড় দেহে সহ্য হয় না। শলাকা বিঁধছে যেন অজস্র। এক দণ্ড জিরেন নেবে না জোসেফ, এমনই তার অস্থিরতা, চাঞ্চল্য। ভয় আর আশংকা। চালের গাড়ীর দরজার কুলুপ ভেঙে একটা বস্তা কোন রকমে আত্মসাৎ করতে পারলেই জোসেফের যাত্রা ও উদ্দেশ্য সফল হয়। লাইনের কাঁকর হাতে আর পায়ে ফুটছে। হয়তো বা হাঁটু দুটো

ছিঁড়েকুটে রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। গাড়ীর তলায় তলায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হয় জোসেফকে। আরেকটু যেতে পারলেই চালের গাড়ী।

হুম্ হুম্ গুলী দাগলো কেউ কোথায়! মেঘ ডাকলো যেন গুরু গুরু। ঠিক ঠাওরাতে পারলো না জোসেফ। আকাশের ডাকা-ডাকি, বজ্রনিনাদ না বন্দুকের যন্ত্র-ধ্বনি, কানে যেন ঠিক ধরা যায় না। আড়াআড়ি সটান শুয়ে পড়তে হয় তৎক্ষণাৎ। কঠোর-কঠিন কাঁকর-ভূমিতে কান পাতলো জোসেফ। আরও দুটি আওয়াজ ফাটলো। হুম্ হুম্। কানে যেন ধরা পড়লো শব্দের উৎস। আকাশ নয়, মাটি। জোসেফের আশপাশ দিয়ে সাঁই সাঁই গুলী ছুটছে। মালগাড়ীতে লাগছে আর ঠিকরে ঠিকরে বেরিয়ে যাচ্ছে সশব্দে।

আর নয়। ঢের হয়েছে। বুকে হাঁটা হামাগুড়ি থেমে যায়।

জোসেফ যে পথে আসে সেই পথ ধরে দুরু দুরু বক্ষে। গতিটা বড় জোরালো, জানমাল হারানোর শংকায়। মরুক ক্ষতি নেই, মরতে সে প্রস্তুত আছে। কিন্তু এই একজনের লাসের তল্লাসে লেগে পুলিস হয়তো আবিষ্কার করবে আরও অনেক খুন-রাহাজানির সন্ধান। তখন মৃত জোসেফের দেহ বপু থেকে সাক্ষ্য দেবে আরও কয়েকটা আঘাতের ক্ষতচিহ্ন। জোসেফের ফাটা-কপালে গোটা কয়েক খোঁচাখুঁচির দাগ। ডান বাহুতে লম্বা একটা লাইন। পাক্কা তিন মাস ভুগতে হয়েছিল জোসেফকে। রায়মঙ্গলের একটা সেকেলে মজা ক্যানেলে, এক রাতে নৌকালুট করলো জোসেফের সাঙ্গপাঙ্গ। জোসেফ লীডার। সেবারও টাকাকড়ি, মালমসলা ড্যাঙ্গায় তুলে শেষ পর্যন্ত আঘাত সামলানো দায় হয়ে ওঠে। ঘা বিষিয়ে গেছিল টোটকা চিকিৎসায়।

শেষ গাড়ীর তলা থেকে বেরিয়ে জোসেফ উঁচু টিলার গড়ানে রাস্তা ধরে। ভিজে কাশের ঝোপে নিজেকে লুকিয়ে আবার সেই অজগর গমন। খানিকটা যেতে পারলেই বন-জংগল পাওয়া যাবে। রাশি রাশি কাশফুল, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধরাশায়ী প্রায়। ভূমিআনত।

টিলার ওপর থেকে একটা ঝাঁপ দেয় জোসেফ। হনুমানের মত লাফ দেয় যেন একটা। এবং তখনই উঠে বাবলার বনে পালিয়ে যায়।

সাঁই সাঁই গুলী ছুটছে। পেছনে রেল-পুলিসের রাইফেল আর্তনাদ করছে এক নাগাড়ে। দুম্ দুম্ দুম্ দুম্!

কড়কড়িয়ে বাজ পড়লো কাছাকাছি কোথায়। বাবলার শাখ'-ভেদী আকাশের একটুখানি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। জোসেফ দেখতে পায়, দূরে লাইট হাউস। বাতিঘর। তার পেছনে বিজলীর ছুটন্ত রেখা।

পাতিলেবুর গাছের আড়ালে ধপাস করে ব'সে পড়লো জোসেফ। বললে,—শালা পুলিস—

ভয়ের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছে, এখন খানিক দম নেওয়া যায়। বৃষ্টিজলের নকল নালায় মুখ দেয় জোসেফ। অনেকটা ঘোলাটে জল খেয়ে ফেলে এক নিঃশ্বাসে। তবুও বিশ্বাস নেই, রেল পুলিস পিছু নিতে পারে। ক'টা শ্বাস টানে জোসেফ। বুকভরা। হাঁফ-ধরা বুকটা জোসেফের ঘন ঘন উঠছে নামছে। কামারশালের হাঁপরের মত। এই হাঁপরের মধ্যে এখনও জ্বলজ্বল করছে, অগ্নি-পিণ্ডের মত রাণীর মুখখানি।

দিনমানের সূর্য নেই আকাশে। সাঁঝের আঁধার নেমেছে যেন। ঘরের ভেতর আরও অন্ধকার। হিমশীতল অন্ধকার।

রাণীবৌ মাটির দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে কি সব কথা বলছে। ঘরের মাটিতে একখানা ছেঁড়া মাতুর বিছিয়ে লক্ষ্মণ সামন্ত হয়তো ঘুমিয়েই প'ড়েছে। রাণীবৌ যা বলছে, শুনছে কি না শুনছে তার ঠিক নেই। রাণীর চুলগুলি উড়ছে মাথায়। কপালে নাচানাচি করছে কোঁকড়া কুন্তল। বাচ্ছাদের মুখে আজ গ্রাস দিতে পারলো না রাণী। একেবারে উপোষী না রাখলেও ভরাপেট খাওয়া জুটলো না ভাগ্যে—ঘরে চাল নেই এক কুনকে। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে যা শুধু কয়েক মুষ্টি ধান আছে। কালীচরণের ধান্যলক্ষ্মী। প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার পূজার ব্যবস্থাটা অবশ্য রাণীবৌয়ের সাধ। গাঁয়ের পুরোহিত মাসে এক টাকার কড়ারে চারপাঁচ দিনের আনুষ্ঠানিক পূজাটা সেরে দিয়ে যান। ব্রাহ্মণের কাজ করেন।

—বাচ্ছা কটাকে খাওয়া রাণীবৌ। লক্ষ্মণ সামন্ত কথা বললে হি হি কাঁপতে কাঁপতে। পাশ ফিরে শুয়ে রইলো।

—খেয়েছে তারা। খাইয়েছি।

—কি ? লক্ষ্মণ শুধোয় ঘুমের ঘন সুরে।

—ডালের খিচুড়ী। শাক চচ্চড়ি। আলুসেদ্ধ।

একটা হাই তুললো লক্ষ্মণ সামন্ত। ফেঁসে যাওয়া শাড়ীখানায় আপাদ-মস্তক ঢেকে নিয়ে সত্যিই হযতো ঘুমিয়ে পড়লো। চোখ আর খুলতে চায় না। রাতজাগা লাল দু'টি চোখ। গত রাতের নেশায় লাল।

রাণীবৌ ইঁদারার ধারে চললো। সত্যিকার স্নান সারতে হবে আজ। বৃষ্টিতে স্নান নয়, কলসী কলসী জল ঢালবে মাথায় সে। মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। পোড়াকপালের ফল্গু-আগুন !

ঘরের চালায় লাঠি পিঠছে কারা যেন। বৃষ্টির ধারাপাতের আছাড় খাওয়া শব্দ। লক্ষ্মণের নাক ডাকতে শুরু করেছে। রাণী-

থো ঘরের দুয়োরটা ভেজিয়ে দিয়ে যায়। আহা, লক্ষ্মণ ঘুমোক খানিক। নয়তো যুজবে কোথা থেকে?

কড়কড়িয়ে বাজ ডাকলো আকাশে। রাণীর বুক চমকালো, পত্রপুটের মত। ঘরের বাইরে পা দিতেই নয়া সড়কের মিছিলের হাহাকার কানে ভাসলো। আর্তধ্বনি, ভীরু মানুষের।

পৃথিবীর টুকরো টুকরো মাটি, ভেসে চলেছে শোলার ভেলার মত।

চাঁই-চাঁই মাটিতে আগাছা, লতাগুল্ম, কচুরীপানা। দূর থেকে দেখায় সবুজ খেয়া চলেছে অসংখ্য। যুদ্ধতরী চলেছে রাজ্য আক্রমণে। উপড়ে-পড়া গাছ-গাছড়া ভাসতে ভাসতে চলেছে। চলমান কমোফ্লেজ্ যেন। কারা কোথায় অট্টহাসি হাসছে। লম্পট প্রগল্ভার নির্লজ্জ হাসি। জলের তোড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দিয়ে যুবতী বারাঙ্গনার দল যেন অভিসারে চলেছে দিলখোলা হাসতে হাসতে। থেকে থেকে বাঁশবনে বাঁশীর আওয়াজ নেচে ওঠে। সুরের জ্ঞান নেই, বেতালা বেসুরো। তাণ্ডবমূর্তি বাতাসের লীলা-খেলা। কি এক নেশায় ক্ষেপে উঠেছে কে জানে। কখনও হাসছে, কখনও কাঁদছে।

আকাশ বিষন্ন, বিমর্ষ। শোকের ছায়া থমথম করছে যেন। বন্যাজলের ঘোলাটে রঙ ধ'রেছে। অনেক উঁচুতে, মেঘের কাছা-কাছি প্রায়, ঝাঁক-ঝাঁক চাতকপাখী উড়ছে। বাতাসের গর্জন যখন চাপা পড়ে, তখন পাখীর কলকাকলী শোনা যায়। চাতকের দল উল্লাসে ডাকাডাকি করে। তৃষ্ণা মিটেছে, তাই হয়তো।

ক'দিন আর ক'রাত ঘরমুখো হ'ল না চৌধুরী। আজ ঘরে যাওয়ার নাম ক'রে কোথায় যে সটকে পড়লো কেউ জানে না। সত্যিই চৌধুরীর মনটা হুহু করেছে গতরাতে। অন্যের ঘর সামলাতে এসেছে, নিজের চালাখানা বন্যাজলে ভেসে যাওয়া এমন

কিছু অসম্ভব নয়। সেই ঘরের মানুষও যদি যায়। চৌধুরীর জোয়ান ডাগর বৌটা আছে, এক ছেলের মা। ছেলেটা যেমন অবাধ্য তেমনই দুরন্ত। আর আছে চৌধুরীর বুড়ী মা। একেবারে অথর্ব। বাতে পঙ্গু। চলতে ফিরতে পারে না। তারা বেঁচে আছে না ম'রে আছে, জানে না চৌধুরী। সমর্থ বৌটা বিধবা হওয়ার ভয়ে কেঁদে কেঁদেই সারা হয় ওদিকে।

দোষ নেই চৌধুরীর। সে ঠিকই ঘরের উদ্দেশে হনহনিয়ে চলেছিল। ঝড়বৃষ্টি মাথার 'পরে, ভয়ডর নেই যেন। বাবলার জঙ্গল থেকে হঠাৎ ডাক পড়েছে তার। নাম ধরে ডাক। চৌধুরীর মত দামালও ভয় পেয়ে থমকে যায়। তারপর বুঝতে পারে ভাটিখানা আছে বাবলার জঙ্গলে। তাড়ির আড্ডা আছে। এমন বাদল দিনে নেশার্তদের ভীড় জমেছে। তালপাতার ছাউনি আছে খানকয়েক। চৌধুরীকে আসতে দেখে একদল লোক উচ্চহাস্যে অভিনন্দন জানায়। স্বজাতির একজনকে দেখতে পেয়ে সব যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওঠে। তারা গায়ের জোরে টানাটানি করে, বসিয়ে দেয় চৌধুরীকে আসবের মধ্যিখানে। পাত্র এগিয়ে দেয়। শালপাতা ধরে সামনে। পাতায় মুঠো মুঠো ভিজে ছোলা। পানের সঙ্গে অনুপান।

—কালীচরণের লেগে যত ঝামেলা! নিজের মনে কথা বলে চৌধুরী। কেমন আক্ষেপের সুরে। একখানা চাটাই টেনে নিয়ে বসে উবু হয়ে। বলে,—পাত্তা মিলছে না তার। বেনো জলে ভেসে গেছে কমনে।

—লাস মিলে নাই? একজন শুধোয় সাগ্রহে। সভয়ে।

এপাশে ওপাশে মাথা দোলায় চৌধুরী। বলে,—উহু। অনেক তল্লাসী হয়েছে, বহুৎ খোঁজাখুঁজি করেছি।

—এখন উপায়টা কি ?

—ভগবান জানে। কথা বললে চৌধুরী। বিরক্তির সঙ্গে বলে,
—কালীর একঘর কাচ্ছাবাচ্ছা, দেখবার কেউ নাই।

—কালীচরণের ফুটফুটে বৌটা নাই ?

—আছে গো আছে। কথার শেষে চৌধুরী মুখের কাছে কলসী তুলে ধরে। ঢকঢকিয়ে খায় খানিকটা। কলসী নামিয়ে বলে,—ঘাড়ে ঝুঁকি লিতে ডর লাগে। এই মাঘ্‌ঘি-গণ্ডার দিনে কে খাওয়াবে ?

আশপাশে সকলেই শোনে চৌধুরীর কথাগুলো। কেউ আর রা কাড়ে না। খানিকক্ষণের নীরবতায় বৃষ্টিঝরা ঝমঝমে সুর স্পষ্টতর হয়। তালপাতার ছাউনিতে জল ঝরছে। নকল-নালার সৃষ্টি হয়েছে অনেক। বাবলার জঙ্গলের গা ঘেঁষে বয়ে গেছে চাষের ক্যানেল। উপচে পড়ছে টইটম্বুর জলে। নকল-নালা থেকে ক্যানেলে গিয়ে পড়ছে জলের ধারা। জল-প্রপাত যেন। ভয়ার্ত কাক ডাকছে। ঝড়োকাক। কত কষ্টের তৈরী বাসা উড়ে গেছে জলঝড়ে। শাবকদেরও পাত্তা মিলছে না। শিয়ালের পেটে গেছে হয়তো।

পূবের আকাশ গর্জে উঠলো কড়কড়িয়ে। বিদ্যুতের হলুদ-আঁচল দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল লজ্জাবতীর মত।

একজন বললে,—আপন কুকুর পথ্যি পায় না আমাগোর। দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের লিয়ে যত দুশ্চিন্তা! ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। আধপেটা খাই।

অর্থনৈতিক আলোচনাটা কেমন নীরস ঠেকে। দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাল লাগে না নেশার ঝোঁকে। আসল না হোক, নেশার ঘোরে হাসতে সাধ যায়। হাসির কথা শুনতে মন চায়। কার যেন

হাসিমুখের হাসি দেখতে ইচ্ছা জাগে। মনের মানুষের মুখের হাসি কি মিষ্টি ঠেকে নেশার চোখে!

এক মুঠো ছোলা মুখে ফেলে দিয়ে চিবিয়ে নেয় চৌধুরী। চোয়াল দুটো যেন অনড় হয়ে আছে। বেলা দুপুরে গড়িয়েছে, মুখে কিছু পড়েনি। পেটে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ। ক্ষুধার জ্বালা।

—কালীচরণের বৌটা খুব শেয়ানা। চালাক-চতুর। কথা বললে একজন, নেশায় জড়ানো কণ্ঠে। বললে,—তার ওপর চটক আছে বেশ। ঠাট-ঠমকও জানে। কেলেচরণকে ভুলতে কতক্ষণ!

কেউ কেউ হেসে উঠলো সরবে। একজন হাসতে হাসতে বললে,—চালকলের সাহাবাবুদের নেক-নজরে পড়লে আর দেখতে হবে না!

কলসীটা ফের মুখে তোলে চৌধুরী। ঢক ঢক শব্দটা চাপা পড়ে যায় হাসাহাসিতে। সাহাবাবুদের নাম উঠতে হাসির জোয়ার ওঠে একটা। প্রচুর টাকার মালিক সাহাবাবুরা। নগদ টাকার গদীতে না কি ব'সে থাকে। এক একজন বাবুর হাফ-ডজন মেয়ে-মানুষ। খোরপোষ পায় তারা। পালাপার্বণে কাপড় গহনা পায়। খারাপ রোগ আর অসুখের ভয়ে শহরের নির্দিষ্ট এলাকায় যেতে বড় ভয় বাবুদের। টাকা পয়সা খরচা ক'রে ব্যাধি কিনতে হয়, দেহ থেকে দেহে সংক্রমণ। তখন শরীর শুধু নয়, জীবনটাও বিষময় হয়ে ওঠে। আবার এই বিষের ধারা উত্তরপুরুষেও অধিকার করে। তাদের রক্তে মিশে যায়। রক্ত দুষ্ট হয়। বাবুদের ভয়ের কারণ একাধিক।

তাই সাহাবাবুদের নজর বাজারের দিকে নয়। বাজারের কেনা-খাবার খাওয়া মানেই মরণকে ডেকে আনা। তাও ঠিক মৃত্যু নয়,

জিলে জিলে মন্না। সাহাবাবুরা তাই দুঃখী অভাবী গরীব-গরবাদের দিকেই পক্ষপাত দেখায়। আর যাই হোক, রোগভোগের আশঙ্কা নেই ভত। বিষের ভয় নেই।

আরও এক মুঠো ছোলা মুখে ফেলে দেয় চৌধুরী। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে,—এ সব কথা যেতে দাও। যার ভাগ্যে যা আছে।

সেই মুখখানি চৌধুরীর চোখে হঠাৎ ভেসে ওঠে সন্ধ্যাতারার মত। ক্ষীণ একটা হাসির রেখা সেই মুখে। কারণে অকারণে রাণীবৌয়ের মুখে হাসি লেগেই আছে সদাক্ষণ। যে অন্যমনা তাকেও যেন আকর্ষণ করে এই সহজ সরল হাসি। চৌধুরী মনে মনে ঠিক করে, একবার কিছুক্ষণের তরে নিজের ঘরে ফিরে দেখা দিয়ে আসবে। খোঁজ-খবর নিয়ে আসবে, কে কেমন আছে। বেঁচে আছে না ম'রে আছে।

বেনো জলের নকল নালা ঝ'রে পড়ছে ক্যানেলে। হুড্রো আর নায়েগ্রার বেগ যেন বন্যাজলের। কৃত্রিম জল-প্রপাতের একটানা শব্দে বাবলা-বন কেঁপে কেঁপে উঠছে। ভাটিখানার মানুষগুলি তালপাতার ছাউনিতে আশ্রয় নিয়েছে। কাঠের পিঁড়িতে বসেছে এক একটা দল বেঁধে। মধ্যিখানে ভাঁড় আর কলসী। তাড়ির উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে আছে বাবলার জঙ্গলে।

হঠাৎ এক যান্ত্রিক আওয়াজ ভাসলো মেঘের কিনারায়। এরোপ্লেনের প্রপেলার ঘুরছে যেন অদম্য গতিতে। নয়তো উড়ন্ত চাকি, পাক খেতে খেতে আসছে, বিদ্যুৎ বেগে। রকেট ছুটছে না কি!

- নেশাচ্ছন্ন মানুষের দল চমকে চমকে ওঠে। আকাশের ডাক নয় এমন। মেঘের গর্জনে একটানা ছন্দ থাকে কৈ?

হু'খানা হেলিকপ্টর, আসছে শহরের মাথা ছুঁয়ে। পশ্চিম বাঙলা সরকারের বাহন। গত কাল দুপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিল মহাকরণিক। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর আহ্বান। জানিয়েছেন, 'দক্ষিণের বন্যার্তদের সাহায্যে হেলিকপটর পাঠানো হয়েছে, ওষুধ আর খাদ্য পাঠানো হয়েছে।'

চারিদিকে জল, মাঝে সামান্য স্থলে যারা আটক পড়েছে তাদের উদ্ধারে হেলিকপটর। দফায় দফায় যাবে আর আসবে। পতিত-পাবন হেলিকপটর ছুটেছে জটায়ু পাখীর মত। বাবলা-বনের ওপর দিয়ে ছুটছে।

তালপাতার ছাউনির তলায় নেশাতুরের দল জোয়ান মরদ হ'লে কি হয়, সকলেই দস্তুরমত ভীত হয়ে ওঠে। বন-বাদাড়, জলা-জঙ্গলে সভ্য-পৃথিবীর যন্ত্র-বাহন কেন? সত্যি কেমন যেন বেমানান ঠেকে চোখে। দেখলে হাসি পায়। এই বুনো আবহাওয়ায় খাপ খায় না যেন।

—হাওয়া-জাহাজ না কি? মুখ থেকে কলসী নামিয়ে বিকৃত সুরে বললে চৌধুরী। চোখ কপালে তুলে দৃষ্টি চালায় আকাশে। তালপাতার ছাউনির তলা থেকে নজরে পড়ে, একটা বিরাটবপু পাখী উড়ে চলেছে যেন। উদ্ধারকল্পে ছুটছে পরিত্রাতা। মূর্তিমান ভয়!

—হাঁ গো হাঁ। পিলেন গো পিলেন। কে যেন বললে স্থির নিশ্চয়তার সঙ্গে। বললে,—কে জানে, হয়তো বে অফ্ বেঙ্গলে জাহাজডুবি হয়েছে। নাবিক আর যাত্রীদের বাঁচাতে চলেছে। গত সালে একখান ফেরীজাহাজ চোরাবালির চড়ায় আটকে মাঝ-দরিয়ায় ডুবে গেল। পিলেন এসে রক্ষে করলে জনা পঞ্চাশকে বাদবাকী জলে ডুবলো।

আগন্তুকের গন্তব্য বোঝা যায় না। ছুটছে তো ছুটছেই। হেলিকপটরের মাথায় বিশাল পাখা ঘুরছে ঘর্ঘর শব্দে। রায়-মঙ্গলের চড়ায় কয়েক শত শিশু আর নারী, বন্দী অবস্থায় ক'টা দিন কাটিয়ে দিয়েছে। চারিদিকে জল, মধ্যিখানে স্থল। দেড়শো বিঘা জমি, রবি ফসলের। জলের আবেষ্টনে অচল অবস্থা মানুষের সেখানে।

ক্যানেলের জল গর্জে গর্জে উঠছে। বাবলা-বনের কোল ঘেঁষে ক্যানেলের ধারা গেছে কোথায় কত দূরে। ফসলের জমির বক্ষ ভেদ ক'রে এগিয়ে গেছে অনেক দূর। চাষীদের কাছে না কি স্বর্গের সমতুল্য এই ক্যানেল আজ উপচে উঠছে। মাঠ আর ঘাট আজ একাকার। ভূমি দেখা যায় না, শুধুই জল।

—ক্ষেমা দাও ভাই সব। আমি বিদেয় লই। আর লয়। কথা বলতে বলতে সত্যিই উঠে পড়লো চৌধুরী। একটা আড়-মোড়া ভাঙলো। গাঁটে গাঁটে খুট খট শব্দ উঠলো।

নেশার আধিক্যে ক'জন আর বসতে পারে না। আড় হয়ে গড়িয়ে পড়েছে তারা মাটিতে। প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। গোঙানির গোঁ গোঁ ছাউনিতে। কেউ কেউ ভুল বকছে। বেসামাল হয়ে পড়েছে। খিস্তী করছে কেউ, অশ্লীল ভাষায়। অদৃশ্য শত্রুদের মা-বোনকে গাল পাড়ছে। যা নয় তাই বলছে।

ওদিকের ছাউনিতে দুই দলে হাতাহাতি লাগলো। দাম দেওয়ার ব্যাপারে পয়সার এদিক ওদিক হওয়ায় অপ্রকৃতিস্থ কয়েক জন মারামারি করছে। আক্রান্তের গলা ফাটা চীৎকার ভেসে আসছে। রক্তারক্তি কাণ্ড চলেছে।

সত্যিই চৌধুরী ছাউনি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। পা চালিয়েছে জোরে। বেলা অনেক হয়ে গেছে। বাদ্‌লা আকাশ দেখে ঠিক

ঠাওরানো যায় না দিনের গতি। ঘরের পথ ধ'রলো চৌধুরী। একবার শুধু যাবে আর আসবে। দেখে আসবে কে কেমন আছে। শহরের ধারে চৌধুরীর বাসা, বন্যাজল হয়তো সেদিকের উঁচু ডাঙ্গায় উঠতে পারবে না। কিন্তু কিছুই বলা যায় না অনুমানে। সর্বনাশা বন্যাকে বিশ্বাস নেই। বাছ বিচার রাখে না এই অসতী।

ঘরে পৌঁছে একবার দেখা দেওয়া মাত্র। রোজগারের টাকা পয়সা সোনা দানা বৌটার আঁচলে তুলে দিলেই বৌয়ের বুকে খুশীর বান ডাকবে। রূপা আর সোনাতেই যত আনন্দ বৌদের, বেঁচে থাকার সার্থকতা।

চামেলী হয়তো বলবে,—থাক আজ আর পারঘাটে যেতে হবে না। থাকো কেনে আমার কাছে। এমন বর্ষার দিনে—

চলতে চলতে আপন মনে হেসে ফেললো চৌধুরী। বৌটার মুখের কথা তার কানে যেন গুঞ্জন তুলছে। তাড়াকাড়ি পা চালালো চৌধুরী। লম্বা লম্বা পদক্ষেপ। কর্দমাক্ত মাটিতে পা সিঁদিয়ে যায়। চলার গতি বাধা পায়।

ছুঁচালো চিবুক ধ'রে নাড়া দেবে চামেলীর। মুখখানি দুলিয়ে দুলিয়ে চৌধুরী দু' চারটে বাঁধা বুলি আওড়াবে। ঘরে ব'সে সময় নষ্ট করলে উপার্জন হবে না, এই অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়বে। ঠিক যাওয়ার আগে চামেলীর কানে কানে ফিস ফিস করবে,—বৌ, তোর পেটে যদি বাচ্ছা আসে।

চমকে শিউরে উঠবে এক ছেলের মা চামেলী। আপনা থেকেই তার মুখ ব্যাজার হয়ে উঠবে ভয় আর বিরক্তিতে। প্রসব যন্ত্রণার ভয় চামেলীর।

একটা চিরকালীন ভীতি, কিছুতেই যেন ভুলতে পারে না চামেলী। মনে পড়লেই শিউরে ওঠে। চলতে চলতে হাসি ফোটে

চৌধুরীর মুখে। চামেলীর ভরটা তার কাছে হাস্তকর ঠেকে কত সময়ে।

কড় কড় মেঘ গর্জে উঠতেই চৌধুরীর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। বিদ্যুৎ ঝলসায় বাবলা বনের আঁধারে। বৃষ্টির ধারা হঠাৎ আবার জোরালো হয়েছে কখন। তীরের মত গায়ে মাথায় বিঁধছে বৃষ্টির ফোঁটা। সঙ্গে আছে বাতাসের ধাক্কা। সামলানো দায় হয় যেন। নেহাৎ আধ কলসীটাক তাড়ী গিলেছে চৌধুরী। ঠাণ্ডা জল-হাওয়া নেশার ঝোঁকে বেশ লাগছে তার।

আকাশের চাঁদের মত একখানি মুখ, চৌধুরীর মন-আকাশে বার বার দেখা দেয় আর লুকিয়ে পড়ে। রাণীবৌয়ের সঙ্গে আবার কতক্ষণে দেখা হবে, কে জানে! দেখা হবে আর কথা হবে পরস্পরে। তারপব—

বৌ কিছুতেই খুশী হয় না যেন। এত সাহায্য আর সহযোগ সবই যেন ব্যর্থ মনে হয়। তিন তিনটে মরদ এক ছটাক চাল জোগাড় করতে পারলো না ক'দিনে! চাল তো দূরের কথা এক কণা খুদও চোখে দেখতে পায় না রাণী। দোকান-পাট খুলছে না, হাট-বাজার বসছে না, যান-বাহন চলছে না। পৃথিবীর আহ্নিক গতি শুধু থেমে নেই, দিন আর রাত্রিকে কেউ থামাতে পারে না। মানুষের পেটের ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাও মানুষের আয়ত্তের বাইরে। নিষেধ মানে না, থেকে থেকে জানান দেয় উগ্র জ্বালায়।

ভাতের শূন্য হাঁড়ীর দিকে কাতর চোখে তাকায় বাচ্ছা ক'টা। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। চোখে চোখে অভিযোগ জ্বল জ্বল করছে, তবুও নীরব তারা। যতই হোক ভিজে মাটির দেশের ছেলে-মেয়ে, ভেতো বাঙালী—তারা মরবে তবু মারবে না। সহ্যের সীমা তাদের অসীম। বিপ্লব-বিদ্রোহ কাকে বলে জানে না। মেনে নেয়

কপালের অদেখা লেখা। যত দোষ দেয় ভাগ্যকে —যার অস্তিত্ব নেই।

—রাণীবৌ, আজ মরতে মরতে বেঁচে গেছি। যীশুর কৃপায়। দাওয়ায় উঠে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে কথা বলে জোসেফ। হঠাৎ দেখা দেয় কোথা থেকে এসে। ভগ্নপ্রায় দড়ির খাটিয়াতে ধপাস ব'সে পড়ে।

—কমনে ছিলে তুমি? অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে শুধোয় রাণী। মিহি সুরে। বলে,—কোথায় গেছিলে মরতে?

হেসে ফেললো জোসেফ। অর্থহীন হাসির মত শোনায় যেন। হাসির রেশ টেনে বলে,—চালের আশায় টিশনে গিয়ে মরি আর কি!

রাণী আর লক্ষ্মণ সামন্ত কি এক আলোচনায় আত্মজ্ঞান হারিয়ে কথা বলাবলি করছে, এ হেন সময়ে জোসেফের সাক্ষাৎ পেয়ে দু'জনে ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়ে। রাণীর গা ঘেঁষে বসার সুখটা আর স্থায়ী হতে পারে না। লজ্জার খাতিরে লক্ষ্মণকে খানিক সরে যেতে হয় পাশে। একটা দৃষ্টিকটু দৃশ্য ক্ষণেকের মধ্যে স্বাভাবিক পরিণাম নেয়।

—মালগাড়ী লুঠতে গিয়ে কাজ হয় নাই আর কি! হেসে হেসে কথা বলে লক্ষ্মণ। জ্যোতিষীর মত সে যেন সবই দেখতে পায়, বুঝতে পারে। বললে,—রেল-পুলিস গুলি ছুটিয়েছে তো?

—হাঁরে ভাই, আর বলিস কেনে! জোসেফ বললে ভিজে কাপড়ে মাথা মুছতে মুছতে। বললে,—যীশুর দয়ায় স্রেফ রক্ষে পেয়েছি। সে কি গুলি ছুটানো, দুম দুম গুম গুম থামে না।

কেমন লজ্জায় রাঙিয়ে ওঠে রাণীবৌ। আমতা আমতা কথা বলে। বললে,—আমাগোর তরে জানটা তোমার—

হো হো শব্দে হেসে উঠলো জোসেফ। কিছুই যেন হয়নি এমনি হাসির তোড়। উপেক্ষার সুর। হাসিতে ব্যঙ্গভাব। জোসেফ হাসি থামিয়ে নেয় হঠাৎ। খানিক চুপচাপ থেকে বললে,—বৌ, তোর বাচ্ছাদের মুখে ভাত পড়ছে না। তোর মুখে হাসি দেখা যায় না। মণটাক চাল আনতে পারলে তোর ঘরে সুখের আলো—

চোখ দুটি ছলছল। রাণী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে। চোখের চাউনিতে যেন সব হারানোর শূন্যতা। অন্নাভাবের আসন্ন আশঙ্কায় রাণী যেন নির্বাক নিস্পন্দ। চিন্তায় কোন কুল পাওয়া যায় না। অনেক ভেবেছে রাণী। বিনিদ্রায় রাত কাটায় ছটফটিয়ে। এক অস্বস্তির কাঁটা খচ খচ করে বুকে সারাক্ষণ।

লক্ষ্মণ সামন্ত সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে, তার চোখ মুখেই প্রকাশ। হাই তুলছে যখন তখন।

—এই দেখো না কেনে, হাত পা থেকে রক্ত বইছে। কথার শেষে কনুই আর হাঁটু দুটো দেখিয়ে দেয় জোসেফ। তবু হাসির আভাষ মিলায় না।

লক্ষ্মণ সামন্ত এক ধরনের চুক চুক শব্দ তোলে মুখে। অন্যের দুঃখকষ্টে সহানুভূতির স্বর। লক্ষ্মণ বললে,—ইস্!

চোখ ফেরায় রাণীবৌ। সিক্ত আঁখিপল্লব মুছে নেয় আঁচলে। রক্তচিহ্ন ক'টা দেখতে থাকে ফ্যালফ্যাল চোখে। দেখে তার বুকে যেন মোচড় লাগলো। চাল পাওয়া গেল না, তবু কৃতজ্ঞতায় লজ্জিত হয় রাণী। দেখতে পারে না যেন অধিকক্ষণ। চোখ নামায় ঘরের ভূমিতে চাপা শুকনো গলায় শুধু একটা কথা বলে, —আহা!

জোসেফের কনুই আর হাঁটু থেকে এখনও রক্ত পড়ছে চুঁইয়ে। বৃষ্টিজলে শুকাতে পায় না, তাই রক্তপাত বন্ধ হয় না হয়তো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়লো রাণীবৌ। পিঠের আঁচল সামলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

—কোথায় চললি বৌ? বললে লক্ষ্মণ সামন্ত।

—কাটা-ছেঁড়ার মলম আছে ঘরে। বাইরে থেকে বলে রাণী। সত্যিই সে ব্যথা পেয়েছে মনে। জোসেফের আঘাত-চিহ্ন যেন তার দেহের, বেদনাব জ্বালা তারই। রাণীর মুখের দিকে তাকিয়েই জোসেফ যে চাল চুরির মত একটা বড় রকমের অপরাধ করতে গিয়ে বিফল হয়ে ফিরে এসেছে, রাণীর বুঝতে বাকী থাকে না। রেল-পুলিসের তাড়া খেয়ে নেহাৎ শূন্যহাতে ফিরে এসেছে জোসেফ, কিন্তু আহত হয়েছে যথেষ্ট। মাথার 'পরে মালগাড়ীর কলকব্জা, মাটিতে শুধু খোয়া আর কাঁকর। ফিস্‌প্লেটের কাঠ আর লোহার ক্ল্যাট। নাট্‌-বোল্টু। ইঞ্জিনের পোড়া-কয়লা।

এমনি এক দুর্গম কণ্টকব সুড়ঙ্গসম পথে হামাগুড়ি দিয়ে জান হারানোর ভয়ে ছুটতে হয়েছিল জোসেফকে। পিছন থেকে গুলির ঝাঁক আসছে সাঁই সাঁই, হুইসিল্ বাজিয়ে। ডবল-ব্যাবেল দাগছে রেল-পুলিস।

থু থু! কনুইটা মুখের কাছ বরাবর তুলে থুথু ফেলে জোসেফ। তারপর জিব দিয়ে চাটতে থাকে। নোনতা রক্ত খানিকটা চেটে নেয়। এতেই না কি ক্ষত সেরে যাবে। নিজের মুখের বিষে ক্ষতের বিষক্ষয় হবে। দু'এক টুক্‌রো নুনছাল মুখে চ'লে গেছে রক্তের সঙ্গে। থুক থুক ফেলে দেয় জোসেফ। বলে,—মলম চাইনা রাণীবৌ। ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়, সামান্যি।

সত্যিই হাসি পায় জোসেফের, রাণীর ভয় আর ব্যস্ততায়। এমন কত কত ঘাত-চিহ্ন আঁকা আছে তার শরীরে। আরও অনেক ভীষণ আর অনেক ভয়াবহ। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে জোসেফেব

হো হো শব্দে হেসে উঠলো জোসেফ। কিছুই যেন হয়নি এমনি হাসির তোড়। উপেক্ষার সুর। হাসিতে ব্যঙ্গভাব। জোসেফ হাসি থামিয়ে নেয় হঠাৎ। খানিক চুপচাপ থেকে বললে,—বৌ, তোর বাচ্ছাদের মুখে ভাত পড়ছে না। তোর মুখে হাসি দেখা যায় না। মণটাক চাল আনতে পারলে তোর ঘরে সুখের আলো—

চোখ দুটি ছলছল। রাণী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে। চোখের চাউনিতে যেন সব হারানোর শূন্যতা। অন্নাভাবের আসন্ন আশঙ্কায় রাণী যেন নির্বাক নিস্পন্দ। চিন্তায় কোন কূল পাওয়া যায় না। অনেক ভেবেছে রাণী। বিনিদ্রায় রাত কাটায় ছটফটিয়ে। এক অস্বস্তির কাঁটা খচ খচ করে বুকে সারাক্ষণ।

লক্ষ্মণ সামন্ত সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে, তার চোখ মুখেই প্রকাশ। হাই তুলছে যখন তখন।

—এই দেখো না কেনে, হাত পা থেকে রক্ত বইছে। কথার শেষে কনুই আর হাঁটু দুটো দেখিয়ে দেয় জোসেফ। তবু হাসির আভাষ মিলায় না।

লক্ষ্মণ সামন্ত এক ধরনের চুক চুক শব্দ তোলে মুখে। অন্যের দুঃখকষ্টে সহানুভূতির স্বর। লক্ষ্মণ বললে,—ইস্!

চোখ ফেরায় রাণীবৌ। সিক্ত আঁখিপল্লব মুছে নেয় আঁচলে। রক্তচিহ্ন ক'টা দেখতে থাকে ফ্যালফ্যাল চোখে। দেখে তার বুকে যেন মোচড় লাগলো। চাল পাওয়া গেল না, তবু কৃতজ্ঞতায় লজ্জিত হয় রাণী। দেখতে পারে না যেন অধিকক্ষণ। চোখ নামায় ঘরের ভূমিতে চাপা শুকনো গলায় শুধু একটা কথা বলে, —আহা!

জোসেফের কনুই আর হাঁটু থেকে এখনও রক্ত পড়ছে চুঁইয়ে। বৃষ্টিজলে শুকাতে পায় না, তাই রক্তপাত বন্ধ হয় না হয়তো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়লো রাণীবৌ। পিঠের আঁচল সামলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

—কোথায় চললি বৌ? বললে লক্ষ্মণ সামন্ত।

—কাটা-ছেঁড়ার মলম আছে ঘরে। বাইরে থেকে বলে রাণী। সত্যিই সে ব্যথা পেয়েছে মনে। জোসেফের আঘাত-চিহ্ন যেন তার দেহের, বেদনার জ্বালা তারই। রাণীর মুখের দিকে তাকিয়েই জোসেফ যে চাল চুরির মত একটা বড় রকমের অপরাধ করতে গিয়ে বিফল হয়ে ফিরে এসেছে, রাণীর বুঝতে বাকী থাকে না। রেল-পুলিসের তাড়া খেয়ে নেহাৎ শূন্যহাতে ফিরে এসেছে জোসেফ, কিন্তু আহত হয়েছে যথেষ্ট। মাথার 'পরে মালগাড়ীর কলকব্জা, মাটিতে শুধু খোয়া আর কাঁকর। ফিস্‌প্লেটের কাঠ আর লোহার ক্ল্যাট। নাট্‌-বোল্টু। ইঞ্জিনের পোড়া-কয়লা।

এমনি এক দুর্গম কষ্টকর সুড়ঙ্গসম পথে হামাগুড়ি দিয়ে জ্ঞান হারানোর ভয়ে ছুটতে হয়েছিল জোসেফকে। পিছন থেকে গুলির ঝাঁক আসছে সাঁই সাঁই, হুইসিল্‌ বাজিয়ে। ডবল-ব্যারেল দাগছে রেল-পুলিস।

থু থু! কনুইটা মুখেব কাছ বরাবর তুলে থুথু ফেলে জোসেফ। তারপর জিব দিয়ে চাটতে থাকে। নোনতা রক্ত খানিকটা চেটে নেয়। এতেই না কি ক্ষত সেরে যাবে। নিজের মুখের বিষে ক্ষতের বিষক্ষয় হবে। দু'এক টুকরো নুনছাল মুখে চ'লে গেছে রক্তের সঙ্গে। থুক থুক ফেলে দেয় জোসেফ। বলে,—মলম চাইনা রাণীবৌ। ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়, সামান্যি।

সত্যিই হাসি পায় জোসেফের, রাণীর ভয় আর ব্যস্ততায়। এমন কত কত ঘাত-চিহ্ন আঁকা আছে তার শরীরে। আরও অনেক ভীষণ আর অনেক ভয়াবহ। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে জোসেফের

ঝাড়্ আর পিঠে কেত-আঁচড়া সাপের মত বাঁকা বাঁকা দাগ। ঠিক যেন ট্যাবু আঁকা।

তখন ইংরেজের আমল। ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে তখন বাঙালী প্রেমিক প্রেমিকাদের দেখা মিলতো না। ভিন্‌দেশী জুটীদের বৃন্দাবনে স্বদেশীর প্রবেশাধিকার নেই।, শুধু সাহেব-সুবো। ডাগর ডাগর মেম, বুঁক উঁচিয়ে ঘোরাফেরা করে। সামুদ্রিক বাতাস খায়। আর আঁধার একটু ঘন হ'লেই ঝোপেঝাড়ে আড়ালে আবডালে লুকিয়ে পড়ে জোড়ায় জোড়ায়। মদের ফোয়ারা ছুটতে থাকে কাফে আর রেস্তোরাঁয়। লঞ্চ্ আর মোটরে চলে মিলনলীলা।

জোসেফ তখন হারবারে দাঁড়ি-মাঝির কাজে ছিল। অবরে সবরে জাল আর ছিপ সমেত ভোরের বেলায় গভীর জলের দিকে পাড়ি জমাতো। মাছ উঠলে মহাজনকে বিকিয়ে দিয়ে বেশী টাকাটা মদ-মাংস খেয়েই ফুঁকে দিতো। একটা গোটা কচি পাঁঠা জোসেফ একাই খেতে পারতো তখন।

মার্থা নামে একটি মেয়ে ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা। এক মিলিটারী মেজরের যুবতী কন্যা। বেগুনী স্কার্ফের লোভানি দেখিয়ে চঞ্চলা হরিণীর মত বালুকা-বেলায় মার্থা চলাফেরা করে। ফর্সা নিটোল দেহ এলিয়ে শুয়ে থাকে বালিয়াড়িতে। মাথায় সোনালী চুলের রাশি। নীল চোখ।

ক্যাম্পের সৈনিকদের চোখ পড়লো মার্থার 'পরে। তার দেহবল্লরীতে কি এক উন্মাদনা। খাস ইংরাজ সৈনিকদল শিষ বাজায়, চোখ মারে, হাসাহাসি করে মার্থাকে দেখলেই। অশ্লীল গান গায়।

মার্থা এক ঝলক হেসে তাদের নিরস্ত করে কতদিন। সিরিয়াস্‌লি কিছুই নেয় না মার্থা। হয়তো চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানালে সৈনিকদের

ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। বুটের লাথি খাবে তারা। বন্দুকের কুঁদার গুঁতো খাবে। জেলে হাজতবাসে থাকবে হয়তো।

মার্থাকে প্রায় সকলেই রেহাই দেয়, একমাত্র জোসেফ ছাড়া। শুধু জোসেফ দেখে দেখে লোভ সামলাতে পারে না। এক সাঁঝে অসংযত ক্ষেপার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে মার্থার বুকে। তাকে তুলে নেয় দুই বাহুতে। আপেল-গালটা কামড়ে দেয়।

বাধা দেওয়া নয়, প্রতিবাদও নয়, রাক্ষসের মত একটা মানুষকে আক্রমণ করতে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে মার্থা। তারস্বরে চেঁচায়,—ডেমন! ডেমন!

ধরা পড়ে যায় জোসেফ। থানার ও সি তাকে চাবুক মারে। মাটির নীচের গুহাঘরে ফেলে রাখে দিন সাতেক। সেখানে মশার কামড়ে আর বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের দংশনে শঙ্কর মাছের চাবুকের ঘা বিষিয়ে ওঠে সারা দেহে।

সেই চাবুকের পরশচিহ্ন এখনও মিলায়নি। হয়তো যেদিন শরীরটা ভস্ম হবে সেদিন মিলাবে।

জোসেফও উঠে প'ড়লো। চললো যেদিকে গেছে রাণী। পেছন থেকে তার কোমর জড়িয়ে ধ'রে ফেললে। বললে,—যাসনে আর বৌ। মলম-ফলম চাই না। আয় তোকে চাই।

শেষের কথা তিনটি ফিসফিসিয়ে বলে জোসেফ। রাণীর কানে কানে। রাণীবৌ সম্মতি অসম্মতি কিছুই জানায় না। যে সমর্পিতা সে আর কি বলবে মুখে!

দূরে নয়া-সড়কের মিছিলের ডাকাডাকি আর কলরোলে আকাশ বাতাস মুখরিত। সরকার থেকে সাহায্য এসেছে। খাদ্য, বস্ত্র আর ডাক্তার এসেছে। তাই দলে দলে লোক আসছে গ্রামের শেষ সীমা থেকে। যেন অন্ধকার থেকে আলোয় আসছে।

—ছিঃ, ছেড়ে দাও। ভয়ে ভয়ে বললে রাণীবৌ। বললে,—এমন দিনমানে নয়। লক্ষ্মণ ঠাকুরপো দেখতে পাবে।

কথার শেষে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় রাণী। পাশের কুঠরীতে সিঁদিয়ে যায় সলজ্জায়। কোমরের আলগা হয়ে যাওয়া কাপড় সামলায়।

জোসেফ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে পেছনের দাওয়ায়। হঠাৎ যেন তার নজরে প'ড়েছে ঐ নয়া সড়কের মিছিল। কাতারে কাতারে মানুষ আসছে। সর্বহারা বন্যার্তর দল আসছে।

শহরের দিকে চলেছে, যেখানে ক্যাম্প বসেছে সেবা ত্রাণ সমিতির। সুখের দিনে এই সব মানুষ নিয়ম-শৃঙ্খলার ধার ধারতো না, অন্যায় অবিচারের প্রশ্রয় দিতো, সমাজ-শাসন অমান্য ক'রতো। একতার অভাবে প্রত্যেকেই একেশ্বর।

আজ শৃঙ্খলা এসেছে ওদের মধ্যে। ভয়ের দিনে এক হয়েছে, বিদ্বেষ বৈষম্য ভুলে। নিয়মের মধ্যে চলেছে।

—চায়ের জল চাপাই? রাণী বললে ঘর থেকে। শুধোলে ভাঙা গলায়।

—হাঁ বৌ হাঁ, এক বাটি চা দে। একটুক আদা যদি দিস্। জোসেফ বললে খুশীর সুরে।

বৃষ্টি-বাদলের দিন, গা গতরে ব্যথা, কপাল টন টন করছে। এক বাটি গরম চা খেয়ে যেন সব কষ্ট ভুলে যাবে জোসেফ। বাইরে থেকে কথা বললে জোসেফ! বললে,—সামন্তর পো, পারঘাটে যাবে নাই?

—হাঁ গো যাবো বটে, তবে সেই সাঁঝের আগে নয়। লক্ষ্মণ কথা বললে চেঁচিয়ে। বললে,—তুমি যাবে নাই?

—হাঁ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবো? আম্মো যাবো সাঁঝ-বেলায়।

—তবে দু'জনায় একত্রে যাওয়া যাবে'খন।

রাণীবৌ রসুই ঘরে ঢোকে। উনুন ধারে ব'সে মিয়ানো দিয়াশলাইয়ের কাটি জ্বালায় একটা একটা। ফস্ ক'রে জ্বলে আর নিভে যায়। শলাইয়ের বারুদ জ্বলছে না।

কৃষ্ণমেঘের মত থমথমে মুখ সকলের। নিষ্প্রাণ পাষাণ মূর্তি একটা একটা। যেন শক্ খেয়েছে হঠাৎ। ইলেকট্রিকের শক্ খেয়ে অনড় অচল হয়ে গেছে। যেন ঠিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। কথা নেই মুখে মুখে। চোখে চোখে পলক পড়ছে না। আত্মা পালিয়েছে কখন দেহপিঞ্জর থেকে। খোলস প'ড়ে আছে মাত্র। প্রথম দেখে সত্যিই বেশ ভয় পায় চৌধুরী। বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে খানিক একেবারে থ মেরে থাকে।

বুড়ী মা সুরবালা, বৌ চামেলী আর একরত্তি ছেলেটা যেমনকার তেমনি ব'সে রইলো। একটিবার ফিরেও তাকালো না কেউ। প্রলয়ঝঞ্ঝার আতঙ্ক, বন্যাধারার অবিশ্রান্ত গর্জন, পৃথিবী রসাতলে যেতে ব'সেছে—তবুও দেখা মিললো না ক'দিন ঘরের মনিষের। বেপাত্তা চৌধুরীর মন থেকে হয়তো মুছে গিয়েছিল মা, বৌ, ছেলের স্মৃতি। ভয় দুঃখ অভিমান আর জমে-ওঠা রাগে কেউ আর ফিরে তাকায় না। নির্বাক, নিঃসাড় সকলেই, একই প্রতিক্রিয়ায়।

মাকে এখনও বড্ড ডরায় চৌধুরী। সদাই খিটখিটে মেজাজ বুড়ীর, কিছুতেই যেন খুশী হ'তে চায় না। ছেলের ভাত-কাপড়ে বেঁচে আছে, তবুও কথায় কথায় বুড়ো ছেলেকে মুখ ঝামটানি দেয়, অকথ্য গাল পাড়ে, শাপমান্যি করে। মা তো নয়, যেন ডাইনী-বুড়ী। সত্যি কথা বলতে কি ছেলেকে সুরবালা যেন মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। এখনও মূষিক ঠাওরায়। সেবার রথের

মেলা দেখতে গিয়ে চৌধুরী ডুব মারলো কয়েক দিন। মা সুরবালার অনুমতি নেওয়া হ'ল না। একটা জীবন্ত ভয়কে চৌধুরী যেন ভুলে গিয়েছিল। মেলায় সেবার হরেকরকমের আমদানী। কলকাতা থেকে অপেরা, ম্যাজিক যাত্রার দল এসেছিল। পুতুল নাচ, নাগর-দোলা, জলের চৌবাচ্চায় সত্যিকার মৎস্যকন্যা। মেলার শেষ বরাবর ফাঁকা মাঠে সারি সারি হোগলার ছাউনি। গভীর রাত পর্যন্ত ছাউনিগুলোয় হ্যারিকেনের আলো জ্বলে। স্যাঁতসেঁতে খেলো জমিতে ছেঁড়া চাটাই বিছিয়ে কত লোক লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখে। বাধা আর নিষেধের বালাই নেই এই আনন্দের স্বর্গে। জাতির বিচার নেই, অস্পৃশ্যেরও অবাধ গতি। নকল অপ্সরীর দল লাইন বেঁধে ব'সেছে সস্তা প্রসাধনী গন্ধ ছড়িয়ে। কলকাতা, শ্রীরামপুর, চন্দননগর থেকে দলে দলে এসেছে মেলার বাজারে দু' দশ টাকা কামাতে। বেশী দরের নয়, অল্প মূল্যের।

রথের মেলায় হৈ-হল্লা, জুয়ার আড্ডা, আর স্ফুর্তি-আনন্দে বেশ কিছু টাকা ওড়ায় চৌধুরী। চোলাই মদের দোকানে ফুঁকে দেয় কিছু।

কয়েক রাত্রি পরে ঘরে ফিরতেই সুরবালা ঠাস ঠাস চড়িয়ে দেয় ধাড়ী ছেলেকে। মুখ থেকে ছেলের কথা সরতে দেয় না। বলে,—বে-আক্কেলে বাউণ্ডুলে! মরণ হোক তোর!

আজও শিশুছেলেকে বুকে তুলে নিতেই খ্যাঁক খ্যাঁক চেঁচিয়ে উঠলো সুরবালা। মৃতের মুখে হঠাৎ যেন কথা ফুটলো। বুড়ীর হারানো ক্ষমতা, লুপ্তশক্তি সহসা যেন ফিরে আসে। ধনুকের মত বেঁকে গেছে, তবু কাঁপতে কাঁপতে হনহনিয়ে এগিয়ে যায় চৌধুরীর সামনে। সজোরে একটা ধাক্কা মারে ছেলেকে। চৌধুরী তিন হাত পিছিয়ে যায়। কেমন যেন ধূমাবতীর মত দেখায় সুরবালাকে।

চেঁচিয়ে ওঠে উন্মাদিনীর মত। বলে,—দূর হয়ে যা পোড়ামুখো! এত লোক বানের জলে মরছে, তুই মরলি না কেনে!

শাশুড়ীর কথায় চমকে চমকে ওঠে চামেলী-বৌ। চিবুক অবধি ঘোমটা টেনে উঠে পড়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সাত-তাড়াতাড়ি, দাওয়ায় গিয়ে লুকায় নিজেকে। চালার মধ্যে থাকলে আরও হয়তো অনেক কিছু শুনতে হবে, দেখতে হবে স্বচক্ষে।

সুরবালার জীবনী-শক্তি আবার যেন হঠাৎ লুপ্ত হয়ে যায়। দম ফুরিয়ে যায় বুড়ীর। হাঁফাতে থাকে লম্বা লম্বা শ্বাস টানতে টানতে। রাগ আর উত্তেজনায় সুরবালা ঠক-ঠকিয়ে কাঁপছে। থরথর মুখে কথা জোগায় না। এক বুক দম টেনে নিয়ে অতি কষ্টে আবার বললে,—দুখের ছেলেটার কথাও একবার মনে প'ড়লো না হারামজাদার! বৌটা যে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে মরছে!

কিছুই যেন হয়নি, অকারণেই সুরবালা এত চেঁচামেচি করছে, এমনি ধরনের একটা হাল্কা হাসির আভাস খেলে চৌধুরীর কালো ঠোঁটের ফাঁকে। নিজের ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চৌধুরী। শিশুর বুকের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকি নিজের বুকের অনুভূতিতে শুনতে পায়। সুরবালার আদুরে-দুলাল নাতি এখনও সক্রোধে গম্ভীর। খেয়াল নেই, বাপ এত আদর করছে। বুকে তুলে নিয়েছে তাকে। বোবার মত ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে আছে।

হাসতে হাসতে চৌধুরী বললে,—জাত-কাজে যেছি, দোষটা কি হইছে তাই শুনি? খামাকা আগ করছিস তুই!

—তোর মুখে ঝাঁটা। সুরবালা ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললে চোখ পাকিয়ে। কোটরগত ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। জরাগ্রস্থ বাঘিনীর মত দেখায় যেন সুরবালাকে। নখদন্তহীনা

# রাণীবৌ

বুড়ীর পাংশু ঠোঁট ছুটো থরথরিয়ে কাঁপছে। অনেক চেষ্টাতেও যেন বাগ মানাতে পারছে না নিজের অষ্ঠ-অধরের দ্রুত কম্পন।

হো হো শব্দে হাসতে থাকে চৌধুরী। অনাবিল হাসির সঙ্গে চুমু খায় কচিশিশুর মুখে আর কপালে। ছুই হাতে ছেলেকে শূন্যে তুলে ধরে। তবুও ছেলের মুখে হাসি ফোটে না। থমথমে গাম্ভীর্য মুখে। ক'দিনের অদেখা আর অবহেলা পুরিয়ে দিতে চায় যেন চৌধুরী। কি এক আনন্দে অস্থিরচিত্ত চৌধুরী। কার স্মৃতিতে আচ্ছন্ন তার লুকানো অন্তঃকরণ। বাহিরে প্রকাশ নেই শুধু। চৌধুরীর মনে সোনার খনির সন্ধান মিলেছে যেন। গুপ্ত-গোপন না রাখলে বেহাত হওয়ার ভয়। লোক জানাজানিতে যতেক বিপদের আশঙ্কা। পূর্ণিমার চাঁদের মত ঢলঢল মুখখানি। টানা টানা চোখে আকাশের নীলিমা। ছুঃখশোকেও সেই মুখের ক্ষীণ হাসি আজও অম্লান। আবার কতক্ষণে চোখের দেখা দেখতে পাবে চৌধুরী! রাণীবৌয়ের কাছে ব'সলেই শান্তিতে মনটা যেন ভ'রে যায়। মুখখানি দেখলেও তৃপ্তি।

ছেলেকে মাটিতে নামিয়ে ঘরের ইদিকসিদিক পায়চারী করতে থাকে চৌধুরী। হয়তো খোঁজাখুঁজি করে নিজের বৌটাকে। গেল কোথায় কে জানে। চামেলীকে দেখতে পাওয়া যায় না কোথাও। তাকে চাই এখনই। তার হাতে পয়সাকড়ি হাতিয়ে না দেওয়াতক রেহাই নেই। সুরবালা দেখলেই খামচে খিমচে কাড়াকাড়ি করবে। অশান্তি বাধিয়ে তুলবে সংসারে। মা অপেক্ষা স্ত্রীর প্রতি অধিক বিশ্বাসের দোষটাকে ঢাক পিটিয়ে বলাবলি করবে। প্রতিবেশী লোকের কাছে খাটো করবে চৌধুরীকে। তখন চামেলীর দিন কাটবে খিঁচুনি-চিপটেনে। কেঁদে কেঁদে মরতে হবে বৌটাকে।

দাওয়ায় বেরিয়ে নিশ্চপে ইশারায় ডাকলো চৌধুরী। কথা

পাছে সুরবালা শুনতে পায় সেই ভয়ে বললে ফিসফিসিয়ে,—বৌ, আঁচলটা দেখি তোর।

চামেলী এক পা এক পা এগিয়ে আসে। অভিমানী চাউনি তার ছল ছল চোখে, ঘোমটার ফাঁক থেকে দেখা যায়।

ট্যাঁকের পাক খুলতে খুলতে চৌধুরী বললে,—বাক্স-প্যাঁটরায়, চাবির মধ্যে রাখবি। দেখিস্, মা যেন টের না পায়।

এক মুঠো সোনা রূপা, নক্ষত্রের মত চিকচিক করছে। পারা-পারের কামানো লাভের কড়ি। চামেলীর আঁচলে উজাড় করে দেয় চৌধুরী। সোনার টুকরো, টাকা-আধুলি, খুচরো রেজগী। যে যা পেরেছে দিয়েছে মরণের ভয়ে। বন্যার্তদের চোখের জল মাখানো। কত মানুষের সর্বশেষ সম্বল!

সত্যিই খুশীর হাসি ফুটলো রাগিনী চামেলীর মুখে। নিজের চোখ দু'টিকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। আঁচলে গিরা বাঁধতে বাঁধতে কথা বললে ফিসফিস,—একখান গয়না চাই আমার। একজোড়া বালা চাই।

চাপা হাসি হেসে চৌধুরী বললে,—সবই তো তোর। যা মন চায় করিস। এখন আমাকে খেতে দে যা আছে। শরীলটা আর বইছে না।

—দিন-দুপুরে তাড়ী খেয়েছো কেনে? চামেলী শুধালে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে। বললে,—পেটের ব্যথায় ভুগবে যে আবার। খাওয়া দাওয়া নেই, ফাঁকা নেশা?

পুরানো একটা ব্যথার অসুখ আছে চৌধুরীর। মাঝে মাঝে পেটের কষ্টে ছটফট করে কাটা পাঁঠার মত। চোলাই-মদের

অভ্যাসটা যখন চৌধুরী যৌবনের প্রারম্ভেই পাকাপাকি ভাবে আয়ত্ত করলো তার কিছুকাল পর থেকেই পেটে এক ব্যথার উদ্রেক হয়। অসহনীয় কষ্টে ভুগতে হয় শয্যাশায়ী চৌধুরীকে। তবুও নিষেধ মানতে পারে না যেন। সাময়িক সেরে গেলেই আবার যেন ডানা গজায়।

রাঙা চোখ চৌধুরীর। ঘুমের জড়তায় অর্ধ নিমীলিত। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা ধরছে পেটে। শূন্য উদরে তেমন কিছু না পড়লে কাহিল শরীর যেন ভেঙে পড়বে।

—দই-চিঁড়া খাও, ঘরে আছে। চামেলী কথা বললে মৃদু কণ্ঠে। বললে,—ভাতের চাল নেই ঘরে। পয়সা দিলেও মিলছে না।

হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পায় চৌধুরী। কি যেন মনে পড়ে। তার ঘরেও চাল নেই এমন, যে এক-আধ কুনকে নিয়ে যায় রাণী-বৌয়ের কাছে।

টাকা ফেললে সবই মিলবে বাজারে। শাকশব্জী, তরী-তরকারী, মাছ-মাংস— যা চাও পাওয়া যাবে। শুধু মিলবে না রান্নার চাল। এখন হাজার টাকা দিলেও এক মণ চাল মেলে না। ঘরে যা কিছু থাক, চাল না থাকলে স্রেফ অনাহারে থাকতে হবে। নিরামিষ আমিষ যে যা খাও, পেট ভ'রবে না, ক্ষুধা মিটবে না। কমপক্ষে এক মুষ্টি চাল চাই। কয়েক গ্রাস সাদা ভাত চাই। বিনা চাল-ভাতে বাঙ্গালীর পাকস্থলী কাজ করে না। ঠাণ্ডা আর্থিক বিপর্যয়ে দু' মুঠো ভাত খেলেই দেহ-মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। গরম হয়।

—দই-চিঁড়াই খাই তবে। চৌধুরী ব'সে পড়লো দাওয়ার এক কিনারায়। মাটির দেওয়ালে দেহ এলিয়ে বললে,—টাইম নষ্ট করিস না বৌ। তাড়াতাড়ি দে।

—কেনে এত তাড়া কেনে? চামেলী কথা বললে অকৃত্রিম রাগের সুরে। বললে,—আজ আর যেতে হবে না পারঘাটে।

মনটা ভেঙে পড়ে চৌধুরীর। আশা ছিল, ঘরে তার চাল মিলবে দু'চার গ্রাস। চামেলীকে পটিয়ে পাটিয়ে আদায় করবে প্রতিবেশী মানুষের দুঃখ লাঘবের অছিলায়। তারপর কোঁচড়ে বেঁধে নিয়ে যাবে কালীচরণের বাসায়। রাণীবৌয়ের হাতে তুলে দিয়ে নাম কিনবে। নিজের দাবী জানাতে তখন হয়তো আর বেগ পেতে হবে না। কিন্তু ঈশ্বর এমনই করুণাহীন।

একটা কাঁসি আর এক ঘটি জল বসিয়ে দেয় চামেলী। কাঁসিতে দই আর চিঁড়া। কয়েকটা সাদা বাতাসা। এক জোড়া মর্তমান কলা। কয়েকটা মাছি, ভ্যান ভ্যান করছে কাঁসিতে।

মুখে-হাতে জল দেওয়ার ফুরসৎ হয় না। কাঁসিটা টেনে নিয়ে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে চৌধুরী। বাঁ হাতে মাছি তাড়ায়, ডান হাতে খায়।

বৃষ্টির দাপটে কাছে দূরে কিছুই নজর পড়ে না। অশ্রান্ত বর্ষার শুভ্র পর্দা নেমেছে চতুর্দিকে। কুয়াসাজালে যেন ঢাকা পড়েছে গাছপালা, মাঠঘাট।

—ঘরে ব'সে থাকলে এমন মওকা আর মিলবে না বৌ। খানিক খেয়ে ক্ষুধাকে শান্ত ক'রে কথা বললে চৌধুরী। আধ ঘটি জল ঢক-ঢকিয়ে খাওয়ার পর আবার বললে,—হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলতে নাই বৌ। সুযোগ-সুবিধে বার বার আসে না। ভগবান একবার মিলায়ে দেয়, বার বার দেয় না।

—তবে যা মন চায় তাই হোক। আমি আর মানা করবনি। চামেলী বললে মিহি কণ্ঠে। কান্নার সুরে প্রায়। ছেলেকে কাঁকালে তুলে নেয় কথা বলতে বলতে,

কড়কড়িয়ে হঠাৎ মেঘ ডাকতেই ছেলে মাকে জড়িয়ে ধরে সভয়ে। চামেলীর বুকে মুখখানা লুকিয়ে ফেলে।

—দু'টা পান সেজে দিতে হবে বৌ। শেষ গ্রাস মুখে তোলার আগে বললে চৌধুরী। বললে,—মুখের স্বোয়াদ যেন নষ্ট হয়ে গেছে।

ঘরে সিঁদোয় চামেলী। পানের বাটা নামায় তেকাঠা থেকে। কাঁকাল থেকে ছেলেকে নামিয়ে পান সাজতে বসে ব্যাজার মুখে। আপন মনে বিড়বিড় বকতে থাকে কত কথা। কি যেন অভিযোগ জানায় আপন মনে। বিরক্তিতে ভুরু বাঁকা।

পিঠে ভারী ভারী ঠেকে যেন। আঁচলের ছোট পুঁটলীটা বার বার ঠেকছে চামেলীর নরম পিঠে। তাই আর বেশী আপত্তি জানায় না। যেতে নাহি দিব ভাবটুকু অধিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। দু'গাছা বালা হবে তার হাতে। লোহা আর শাঁখার সঙ্গে মকর-মুখী বালা—খুব মানাবে। তখন কাচের চুড়ী আর পরতে হবে না।

ঘরের এককোণে সুরবালা। দুই হাঁটুতে মাথা রেখে কেমন বাঙলা অক্ষর 'দ' সেজে ব'সে আছে। পানের বাটা নামানোর ঠুকটাক শব্দে বিশীর্ণ মুখখানি তোলে। সন্দেহের চোখে দেখে ব্যাটার বৌকে। বুড়ী ঠিক বুঝেছে, তার ছেলে আর বৌ দাওয়ায় বেরিয়ে কি একটা লেনাদেনা চুকিয়ে ফেললে। ফাঁকি দিলে সুর-বালাকে, তার ক্ষীণদৃষ্টি দু'টি চোখকে। অসম্মানের আঘাতে বুড়ী রাগের বশে ঠক ঠক কাঁপছে মাঝে মাঝে। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। অনধিকার।

দুটো পান আর একটা টোকা দাওয়ার এক পাশে রেখে নিজের কুঠরীতে স'টকে পড়ে চামেলী। বাক্স-প্যাঁটরা খোলাখুলি

করে নিঃশব্দে। বৌজানে, যাওয়ার আগে একবার দেখা ক'রতে আসবেই চৌধুরী। বলতে আসবে,—বিবিজান, হুকুম দাও। কাজে যাই।

চামেলী মনে মনে দুর্গা-নাম স্মরণের সঙ্গে বলবে,—তবে এসো। যাই বলতে নাই।

গালে পান দিয়ে, মাথায় টোকা চাপিয়ে দাওয়া থেকে মাঠে নামবে চৌধুরী। খানিক দূর এগিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলবে। সাবধান করবে চামেলীকে। বলবে,—বৌ, দুয়োর-কপাট খোলা-মেলা থাকে না যেন। দিনকাল ভাল নয়। হুঁসিয়ার হয়ে থাকবি।

চামেলী ক্ষুণ্ণমনে দাওয়ার একখান বাঁশ ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ তার ঠিক নেই। আলের ওধারে পৌঁছে অদৃশ্য হবে চৌধুরী। বৌ দুর্গানাম জপবে অনর্গল। দুর্গতি না হয় যেন। রক্ষা কর, জয় মা রক্ষাকালী।

হেলিকপটর যাওয়া আসা করছে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। চারিদিকে সীমাহীন জল, মধ্যে সামান্য স্থলে শূন্য প্রান্তরে হেলিকপটর নামছে সশব্দে। জলবন্দী শিশু আর নারীদের কান্নার মাঝে আকাশযানের যান্ত্রিক আওয়াজ। পাখা ঘুরছে তীব্র গতিতে। পেটের মধ্যে একটা একটা দলকে চাপিয়ে হেলিকপটর ফিরে চলছে শহরমুখে—বিপদের এলাকা থেকে অনেক দূরে।

কালীচরণের বাচ্ছাগুলো তাকিয়ে আছে হাঁ ক'রে আকাশের দিকে। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যকে একত্রে দেখতে পেয়েছে যেন। চোখের পলক পড়ছে না। অদ্ভুত এক বিস্ময়ের চলচ্চিত্র দেখছে যেন আকাশে।

একদৃষ্টে লক্ষ্য করে রাণী। ছেলেমেয়ের কি বিশ্রী আকৃতি হয়েছে! দুর্ভিক্ষের আসামীর মত অস্থিপিঞ্জরসার। চোখের তলায় তলায় অনাহারের কালিমা প'ড়েছে। চেহারা-কমজোরী হয়ে পড়ছে সব। বাতাসের জোরালো ধাক্কায় প'ড়ে যাবে হয়তো বা। মুখে মুখে রক্তহীনতার শুভ্রতা। পাংশু পাণ্ডুব। বুকের পাঁজরা-গুলো গোনা যায়।

ভাঁড়ারে এত কিছু, মুখে উঠবে না কারও। শাকশব্জী, মিষ্টি-নোনতা, মাছ-মাংস—কিছুতেই রুচি নেই। একমাত্র খাদ্য—চাল-ভাত। অমৃতের সমান যেন। সোনা মিলবে, রূপা মিলবে, হীরা-জহরৎ যা চাইবে বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে—শুধু চাল পাওয়া যাবে না।

মিলবে যেখানে সেই কালোবাজারের সন্ধান সকলে জানে না। সামর্থ্য নেই অনেকের সে বাজারে যাবে। কোথায় সেই বাজার, কোন্ অন্ধকারে! রাণীবৌ নিজের মনকে বার বার এই কথাটা শুধোয়! কালোবাজারের অস্তিত্ব নেই কোথাও নির্দিষ্ট, লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে। পুলিস শুধু জানে, কিন্তু পুলিসের মুখ বন্ধ। ওপরওলার হুকুম নেই কালো বাজারের কালো চোর ধরবে। কলকাতার লালবাজারও কিছু করতে পারে না। সেন্ট্রাল থেকে আদেশ পাওয়া যায় না। দিল্লী চুপচাপ। মন্ত্রীদের মুখে কত গালভরা কথা।

লক্ষ্মণ সামন্ত আর জোসেফ অকাতরে ঘুমোচ্ছে এই অবেলায়। নাক ডাকছে দু'জনের। ঘরের মধ্যে যেন হাঁপর চলছে দু' দুটো। হেলিকপটরের গমনাগমনের শব্দেও ঘুম ভাঙছে না তাদের। কুম্ভ-কর্ণের নিদ্রা যেন।

ঘুমটা একবার মাঝে পাৎলা হ'তেই লক্ষ্মণ সামন্ত কথা ব'লেছে।

তারপর আবার গভীর ঘুমে ডুবে গেছে। রাণীকে লক্ষ্মণ সামন্ত ঘুমের ঘোরে ব'লেছিল,—বৌ, সাঁঝের আঁধার নামলেই আমাগো ডাকবি তুই! খেয়াল রাখিস।

জোসেফ জানে, লক্ষ্মণ তাকে ফেলে যাবে না। তাই তার যেন নিশ্চিন্ততা সুপ্রচুর। একটা কষ্টিপাথরের দীর্ঘ মূর্তি যেন ধরাশায়ী হয়ে প'ড়ে আছে! চরম ক্লান্তিতে প্রায় মৃতের মত অবস্থা জোসেফের। বিনিদ্রায় কেটে গেছে ক'টা রাত্রি। আজ তার শোধ তুলবে জোসফ। ঘুমের মাঝে কি এক স্বপ্নে যেন মশগুল হয়ে আছে জোসেফ। সুখস্বপ্ন দেখছে গভীর ঘুমে। না পাওয়ার বিরক্তি নেই, আছে পাওয়ার সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি। জোসেফের রুক্ষকঠিন বিশ্রী মুখে হাসি ফুটে উঠছে মাঝে মাঝে। পরিতৃপ্তির হাস্যরেখা উঁকি দেয়। মৃতের মুখের হাসির মত দেখায় কেমন ভয়াবহ।

জল-ঝড় চলেছে, হিমঠাণ্ডা বাতাস বইছে, তবুও রাণীর মাথায় আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। চিন্তাজ্বরের অগ্নিদাহন। তার নারী-মন বিদ্রোহ ঘোষণা করে থেকে থেকে। বর্তমান পরিস্থিতি মেনে নিতে চায় না। একজনকে হারিয়ে বহুজনের সঙ্গলিপ্সা—অস্বাভাবিক বেমানান ঠেকে। একটা চরমতম অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে রাণীর দেহ। মন মানতে চায় না। কিন্তু উপায় কৈ? ত্রিসংসারে কেই বা এমন তার আছে যে তাকে খেতে দেবে, পরতে দেবে? অব্যর্থ মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করবে! কেউ নেই, কেউ নেই। রাণীর আপন ভাই আছে ক্যানিঙে, চাষ-আবাদ করে। ভাই খোঁজ-খবর নেয় না। বছরান্তে একবার আসে কি না আসে।

ভাই-বৌ না কি আসতে দেয় না। পাছে ননদের ভার নিতে হয়। তদুপরি ননদ এখন সদ্যবিধবা।

যে দেয় সেই নেয়। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। মানুষের ঘরে ঘরে যদি দাতাকর্ণ থাকে, তবে তো কারও অভাব অনটন থাকতো না। ভাগ্যক্রমে যে অনেক পেয়েছে, যার অনেক আছে—সে যদি তার ভাগ থেকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে, গোটা দুনিয়ার চেহারা তবে পালটে যায়। তাই বিনিময় কথাটির সৃষ্টি হয়েছে সভ্য অভিধানে।

দেওয়া মানেই নেওয়া। দেনা পাওনার হিসাব কষাকষি শুধু হাটবাজারেই সীমাবদ্ধ নয়, ঘর-সংসারেও প্রকট। তাই তো এত চুক্তি আর সর্ত। লেনদেনের কারবার। নাও আর দাও। যেমন দেবে তেমন পাবে।

দূরের ঐ নয়া-সড়কের মিছিলে, ছারপোকার সারিতে মিশে যেতে পারলে তবুও কথা ছিল। রাজছত্রের দুয়োর উন্মুক্ত হয়েছে যেন। ভিখারী আর আশ্রয়প্রার্থীরা দল বেঁধে চলেছে ভিখ্ মাগতে। সরকারী রিলিফের ক্যাম্প বসেছে। সেবাত্রাণ সমিতি এসেছে। খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ আর ডাক্তার এসেছে কলকাতা থেকে।

বাচ্ছা ক'টার হাত ধ'রে গিয়ে হাজির হতে পারে রাণী। কিন্তু তার কানে এসেছে, রিলিফ থেকে চাল মিলছে না এককণা। সোনা, রূপা মিলতে পারে, চাল মিলবে না কোথাও। মাথা পিছু মিলবে না গুঁড়া দুধ। গমের আটা। খৈ-কড়াই। চিনি-লবন। পরনের জন্য মিলের কাপড়। খাটো খাটো ধুতি আর শাড়ী।

যাই হোক শহরপ্রান্তে ক্যাম্পে ক্যাম্পে অভাবনীয় এক শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। অসভ্য আর বেয়াদপ ছেলেমেয়ের দল সেখানে

আজ শান্তশিষ্ট। দেখলে চেনা যাবে না বিপদ আর বিপর্যয়ে কুকীর্তির বেয়াড়াপনা লোপ পেয়েছে। সকলের মুখে মুখে আশঙ্কা, ভয়, অনিশ্চয়তা।

ডাক্তার আর মেয়ে-নার্সের দল বেরিয়ে পড়েছে ইদিকসিদিক। গ্রামে গ্রামে মহামারী দেখা দিয়েছে। হাম, জল-বসন্ত, ওলাওঠা, ঠাণ্ডাজ্বর। বন্যাসঙ্গী রোগের প্রাদুর্ভাবে গ্রাম-বাসিন্দারা ভীত আর সন্ত্রস্ত।

বার-দুয়োরের কড়া ধ'রে নাড়া দেয় কে বা কারা।

বুকের ভেতর হঠাৎ যেন হাতুড়ীর ঘা পড়তে থাকে রাণী-বৌয়ের। কি এক সন্দেহের দোলায় কিংকর্তব্য হারিয়ে ফেলে রাণী। তার সর্বাঙ্গ থরথর কাঁপতে থাকে। তবে কি কালীচরণ ফিরে এসেছে! এ যাবৎ যা শুনেছে রাণী, তা হয়তো সত্যি নয়। কালীচরণ মরেনি, বেঁচে আছে বহাল তবিয়তে।

কড়া ঝনঝনিয়ে ওঠে আবার। দুয়োরে ধাক্কা পড়ে ঘন ঘন।

লক্ষ্মণ সামন্ত আর জোসেফ একেবারে বেহুঁস। বজ্রপাতের বিকট শব্দেও তাদের এই মহানিদ্রা ভঙ্গ হয় না।

ঝিরি ঝিরি বর্ষায় আর উচ্ছ্বসিত ঝড়-হাওয়ায় কড়া নড়ার ঠক্ ঠক চাপা প'ড়ে যায়। রাণীবৌ ভয়ে ভয়ে দুয়ারের দিকে এগোয়। অবশ পা চলতে চায় না যেন। বুক দুরু দুরু করে।

অর্গল খুলতেই বাতাসের হঠাৎ সজোর আক্রমণে দুয়ারের কপাট দুটো দোহাট হয়ে প'ড়ে। টাইফুনের উগ্র বাতাস রাণীর সারা শরীরে শ'য়ে শ'য়ে বেত মারতে থাকে যেন। কোন রকমে কাপড় সামলে রাণী এক পাশে স'রে যায়।

—ঘরে পুরুষ মানুষ নেই ?

বাইরে থেকে কথা বললে এক দল আগন্তুকের একজন মুখপাত্র। এক লহমায় রাণীবৌ দেখে নিয়েছে, দলে তিনজন আছে। ওদের মধ্যে একজন ডাগর মেয়েও আছে। মেয়েটি যেন কেমন মেম-মেম দেখতে। বাকী দু'জন সার্ট-পাৎলুন প'রেছে।

কথাগুলি শুনে রাণী কেঁপে কেঁপে উঠে। হাঁ না কিছুই যেন বলতে পারে না সঠিক। এক দৌড়ে ছুটে পালায়। ঘুমন্ত লক্ষ্মণ সামন্তকে ঠেলে ঠেলে তোলে। বলে,—এই ঠাকুরপো, কারা সব এয়েছে যে! উঠে পড় না ছাই! কি যে ঘুমাও!

ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সলো লক্ষ্মণ। ঘুমন্ত চোখ কচলাতে শুরু করলো। এখনও তার সাড়-চেতনা ফিরছে না দেখে রাণীবৌ রাগতঃ সুরে বললে,—দেখা দাও না উঠে যেয়ে। কি বলতে চায় শুনগে যাও।

বৈকালিক আকাশ, দেখলে কে বলবে। কাজল কালো রাশি রাশি মেঘ টুকরো টুকরো আসে আর জমা হয় একত্রে। গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের মোহানা থেকে চাপ চাপ কাজলের খণ্ডমেঘের দল ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে এখনও। সাঁঝোয়া বাহিনী আসছে যেন কামান দাগতে দাগতে।

—কারে চাই আপনাগোর ?

ঘুম ঘুম চোখে কথা বললে লক্ষ্মণ সামন্ত। তন্দ্রাচ্ছন্ন টলটল দেহটা সামলে নেয় অতি কষ্টে। একটা হাই তোলে।

—আমরা রিলিফ অফিস থেকে আসছি।

—কি চাই আপনাগোর ?

—কিচ্ছু নয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবো ঘরের সকলের। গভর্নমেণ্ট আমাদের পাঠিয়েছে।

দলের মুখপাত্র ডাক্তার কথা বলছেন। সঙ্গে তাঁর কম্পাউণ্ডার না অ্যাসিসটান্ট, মেয়েটি নার্স। সেবিকা। তিনজনেই ঘরে ঢুকলো পর পর। মাথার ছাতা বাইরের দাওয়ায় রেখে ঘরে ঢুকলো।

কালীচরণের বাচ্ছাগুলো একে একে এসে হাজির হয়। শহুরেদের দেখলে গ্রামীনরা যেমন সবিস্ময়ে সলজ্জায় সভয়ে দেখে তেমনি চাউনি ওদের কোটরগত চোখে চোখে। এক পাল দুর্ভিক্ষের আসামী যেন। খেতে পায় কি না পায়। শীর্ণকায়দের গা এত জল-ঝড়েও আদুড়।

ডাক্তার বাচ্ছাদেব মধ্যে মাথায় যে বড় তার হাত ধ'রে কাছে টেনে নিলেন। বললেন,—দেখি হাঁ কর'।

কথার শেষে ডাক্তার ছেলেটার পেট টিপতে শুরু করলেন এখানে সেখানে। ডান দিকের পাঁজরার নীচে আঙুল পড়তেই ছেলেটা যেন আঁৎকে উঠলো। এক হাত পিছিয়ে গেল ব্যথার তীব্রতায়। দাঁতে পায়োরিয়া। জিহ্বা সাদা। গলায় টনসিলটা লক লক ঝুলছে।

—কি খাও? ডাক্তার শুধালেন সহানুভূতির সুরে, মৃদু মৃদু হাসির সঙ্গে।

ছেলেটা যেন বোবা আর বধির। ভয়ে কেমন নীরব। কথা বলতে পারে না। বিপ্লব-বিদ্রোহের ধরা-পড়া আসামী যেন, শতেক জেরায় মুখ খুলবে না। গুলী দেগে মেরে ফেললেও নয়, কোর্ট-মার্শালে।

—দুধ খাও? ডাক্তারই বললেন।

মাথা দোলায় ছেলেটা। এপাশে ওপাশে। না।

—মাছ-মাংস খাও ? আবার বললেন ডাক্তার।

ভৈঁবেচ। আবার মাথা দোলায় ছেলেটা। ডাক্তার তাকে ছেড়ে দিয়ে আর একজনকে টেনে নিলেন সাদরে। তার পেট-পিঠ টিপতে শুরু করলেন। বললেন,—দেখি জিব দেখি। হাঁ ক'রতো তুমি।

হাঁ করলে বাচ্ছাটা। ডাক্তার দেখলেন স্পষ্ট, দাঁতে পোকা। গলার ভেতর সাদা দাগ। ছেলেটার নিস্তেজ চোখের কোল টানলেন ডাক্তার। রক্তের চিহ্ন নেই, ফ্যাকাশে।

ডাক্তার বলেন,—আম, জামরুল, কলা, পেঁপে খাও ? গাছ থেকে পেড়ে ?

উত্তরদাতা নেতিবাচক মুখভঙ্গী ক'রলো। জ্যেষ্ঠর মত দু'পাশে মাথা দুলিয়ে অসম্মতি জানালো।

—তবে কি খাও তোমরা ? হাঁস-মুরগীর ডিম ?

—না।

—আলু, বেগুন, ঝিঙে, করলা ?

—না। না।

ডাক্তার কেমন নিরাশ হয়ে প'ড়লেন যেন। নার্সের সঙ্গে আঁখি বিনিময়ে আর ইংরাজী ভাষায় কি সব বলাবলি করলেন পরস্পরে। রোগী আর ব্যাধি সম্পর্কে টেকনিকাল মত বিনিময় হয়তো। সাটে কথা।

নোট বুকে লিখতে থাকে নার্স। বিবরণ লিখে নেয় রোগী আর রোগের।

রাণীবৌ ঘোমটার ফাঁক থেকে শুষ্ককণ্ঠে বললে,—বাবুমশাই, ওরা ভাত খায় শুধু। আর কিছু খায় না। মুখে তোলে না। দাঁতে কাটে না।

নীরব শ্রোতার মত শুনলেন ডাক্তার জন্মদাত্রীর কাছ থেকে, আসল সংবাদ শুনলেন। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন কেমন বিস্ময়মুখে। অনুসঙ্গী দু'জন চললো পিছু পিছু।

আকাশের দিকে চোখ তুললো ঘুমজাগা লক্ষ্মণ সামন্ত। সন্ধ্যা নেমেছে দিগন্তে। মলিন কুটিল রাত্রি আসছে। অন্ধকারের দেরী নেই আর।

—এ্যাই জোসেফ!

ঘুমন্ত জোসেফের পায়ে পা দিয়ে ডাকলো লক্ষ্মণ। বললে,—উঠ্‌,—উঠ্‌। পারঘাটে যাবি নাই?

—যাবো বটে। জোসেফ কথার শেষে উঠে প'ড়লো। বললে, —চল গো যাই। ডাকো নাই কেনে আমাগো?

—রিলিফের ডাক্তার আসছিল। লক্ষ্মণ কোমরে কাপড়ের কোঁচা জড়াতে জড়াতে কথা বলছে। তৈরি হচ্ছে সে যাত্রার আগে।

—চল' যাই। বললে জোসেফ। আলস্যের বালাই নেই তার। সটান উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। যেমনকার তেমনি চললো দাওয়ার বাইরে। জোসেফ যেন সর্বক্ষণই প্রস্তুত, সর্বকাজেই।

—রাণীবৌ, আমরা যাই। দোরে খিল দাও।

কথা বলতে বলতে লক্ষ্মণও বেরিয়ে প'ড়লো। দু'জনের মাথায় দু'টো টোকা। জল-কাদায় চারটি পায়ের দ্রুত পদাঘাত পড়ছে, তারই ছপ ছপ শব্দটা কানে আসে রাণীবৌয়ের। সে বুঝতে পারে, ওরা দাওয়া থেকে নেমে প'ড়েছে। হয়তো দেরী হয়ে গেছে যাত্রা করতে, তাই প্রায় ছুটছে লক্ষ্মণ আর জোসেফ।

বাচ্ছাদের ডেকে ঘরে এনে দুয়োরে খিল তুলে দেয় রাণীবৌ। অবাধ্য বাতাসে বন্ধ-দ্বার কেঁপে কেঁপে ওঠে। ঠুক ঠাক আওয়াজে

কথা বলে যেন কপাট ছুটো। আবার কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। বল-ভরসা হারিয়ে যায় যেন। নিঃসঙ্গ অসহায় মনে হয় নিজেকে।

—ঘরের বার হোসনি কেউ যেন। বাচ্ছাদের উদ্দেশে রাণীবৌ বললে ভয়ার্ত সুরে। বললে,—আমি আছি রসুই ঘরে। তোদের তরে খান কয়েক রুটি বানিয়ে দিই।

কথা বলতে বলতে রাণী সর্বকনিষ্ঠ শিশুকে বুকে তুলে নেয়। তার খাদ্যপানীয় আছে রাণীর কোমল বুকে। আছে কি নেই কে জানে, শ্বেত রক্ত-কণিকা।

আবার ঝন-ঝনিয়ে নেচে উঠলো বন্ধ তুয়োরের কড়া। কে আবার এলো! রাণীবৌয়েয় বিষণ্ণ মুখে চাপা বিরক্তি ফুটলো। দুগ্ধপায়ী শিশুকে বুক থেকে নামিয়ে তুয়োর খুলতে চললো ভয়ে ভয়ে।

—কে ?

অর্গল খোলার আগে একবার শুধিয়ে নেয় রাণী। চেনা না অচেনা, কে জানে।

—আমি গো রাণীবৌ। তোমাদের চৌধুরী গো, চৌধুরী। সেরটাক চাল এনেছি। হরিচরণ মুদীর আড়ত থেকে চুরি ক'রেছি। পেছনে লোক লেগেছে। খুলেই দাও না তুয়োরটা।

দ্বার খুলতেই চৌধুরী দেখতে পায় আকাশের সন্ধ্যাতারা তার হাতের নাগালে। রাণীবৌয়ের মুখে মিষ্টি মিষ্টি খুশীর হাসি। চাল এনেছে চৌধুরী, স্বর্গ এনেছে যেন। মন্থনের অমৃত এনেছে যেন এক আঁজলা।

চৌধুরীকে হাত ধ'রে টেনে নেয় রাণীবৌ, আনন্দের আতিশয্যে। ঘরে তুয়োরে অর্গলটা তুলে চৌধুরীর সামনা-সামনি দাঁড়ায়। রাণীকে চৌধুরী তার বুকের মধ্যে টেনে নেয়। নিশ্চিন্তার আশ্রয় যেন রাণীর। সেরটাক চাল এনেছে চৌধুরী। অবাক ক'রে দিয়েছে।

বুকে মুখ লুকায় রাণীবৌ। সজল চোখ লুকায়। যে দেয় সেই নেয়, পৃথিবীর নিয়ম। তবে আর বাধা কিসে!

গত কয়েক দিনের মধ্যে বন্যাপ্রলয়ের তাণ্ডবলীলার মত গ্রামে গ্রামে দুষ্টামি, নষ্টামি আর পাপের প্রচণ্ড বান ডেকেছে যেন। চুরি-জুয়াচুরি রাহাজানির দাপটে কোতরং গমগমিয়ে উঠেছে। থানার দারোগা জমাদারের দল কিছুতেই বাগ মানাতে পারে না। আসল চোর আর আসামীদের ধরতে পারে না। আবার ধৃত ব্যক্তিরা নির্দোষ প্রমাণে ছাড়া পেয়ে যায়। তেমন নির্ভারযোগ্য প্রমাণ খুঁজে মেলে না। আপনি যদি থানা আর কোতরংএর নালিসখাতা লক্ষ্য করেন, দেখতে পাবেন অভিযোগের অন্ত নেই যেন। আজ এখানে সিঁদ কাটলো কে বা কারা; কাল কোথাও কারও মুরগী চুরি গেল; কার ফসলী-জমি থেকে কে উপড়ে নিয়ে গেছে শাকশব্জী; পুকুর থেকে মাছ উধাও হয়ে গেছে পুকুরের মালিকের অসাক্ষাতে। চালের আড়তদার পুলিস-খাতায় লিখিত রিপোর্ট দাখিল করেছে। চাল-চুরির অপরাধের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক তল্লাসেও সন্ধান মেলে না।

রাণীর বাড়ন্ত ভাঁড়ার ওদিকে দিনে দিনে ভ'রে উঠতে থাকে।

ঘরের কোণে কোণে স্তূপীকৃত ফলমূল আর তরীতরকারী। আটা আর ময়দার বস্তা। কাঁড়ি কাঁড়ি মাছ। কে যে খাবে তার ঠিক নেই। সব কিছু মিলিয়ে এক ভ্যাপসা গন্ধ ছড়িয়েছে ভাঁড়ারে। পোকামাকড়ের উপদ্রব শুরু হয়েছে খাদ্যবস্তুর আশেপাশে। মাছের গন্ধে প্রলুব্ধ বিড়াল ক'টা ঘোরাফেরা করছে শব্দহীন পদক্ষেপে। রাণীর বাচ্ছাদের তাড়া খেয়ে খানিক অদৃশ্য হয়ে থাকে। আবার আসে লোভে লোভে। পূর্ণ ভাণ্ডার দেখে মাঝে

মাঝে খুশীতে ভ'রে যায় শোকাতুরা রাণীর অবশ মন। আবার হয়তো তৎক্ষণাৎ ভেঙে পড়ে রাণীবৌ। এত খাদ্য, কিন্তু উপোষীদের মুখে রোচে না। মাছ তরকারী দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নেয় রাণীর শাবকপাল। আটার রুটি দাঁতে কাটে না।

তবু যা হোক, গত রাতে একেক গ্রাস চাল জুটেছে কপালে, চৌধুরীর কৃপায়। বাচ্ছাগুলো গোগ্রাসে গিলেছে মুঠো মুঠো ভাত। ফাঁসির আসামীর খাওয়ার মত শেষ-খানা খেয়েছে যেন। তারপর ভাতের নেশায় ঘুমিয়েছে অকাতরে, পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। কচি শিশুটা কেবল সারারাত কঁকিয়ে কঁকিয়ে কেঁদেছে কি এক জ্বালা-যন্ত্রণায়। খানিক চুপ মড়ার মত, আবার চিল-চিৎকার। ভাতের বদলে ক'দিন খেয়েছে কি সব অখাদ্য কুখাদ্য, তারই প্রতিক্রিয়ায় পেটের অসুখ ধ'রে গেছে হয়তো। কাঁথা আর চাটাই নোংরা ক'রেছে বেশ কয়েকবার।

পাশের ঘরে চৌধুরী আর রাণী। দু'জনের কথায় কথায় কেটে গেছে রাতটুকু। কি যে এত গোপন আলাপ কে জানে। ছেলেটা কঁকিয়ে কেঁদে সারা হয়ে যায়, তবুও চৌধুরীর বাহুযুগল থেকে সহসা ছাড়া পায় না রাণীবৌ। অনেক কাকুতি মিনতিতেও রেহাই দেয় না চৌধুরী।

আঁধার ঘরে ছেলে মাকে খোঁজে হাতড়ে হাতড়ে। কান্না থেমে যায় কাহিল কণ্ঠের। মৃত জীবের মত নেতিয়ে পড়ে শিশু।

ফিসফিসিয়ে রাণী বলে,—মুক্তি দাও খানিক, বাচ্ছাটাকে ঘুম পাড়িয়ে আসি।

বিরক্ত হয়েছিল চৌধুরী। বলেছিল রাগের সুরে,—পেটের ব্যারামে বাচ্ছা মরে না। ঘাবড়াও কেনে তুমি?

রাণীবৌ চৌধুরীর মুখে হাত চাপা দেয়। কাঁপা সুরে

বলে,—ছিঃ, এমন কথা বলতে নাই। কেমন ধারার নিষ্ঠুর মানুষ তুমি!

অন্ধকারে দেখা যায় না কিছু। রাণীবৌ দেখতে পায় না, সত্যিই চৌধুরীকে তখন দেখায় যেন নির্দয় পশু। বাঘের থাবার মত চৌধুরীর বজ্রমুষ্টিতে রাণীর দেহটা অনড় অচল হয়ে থাকে। বাধা দিতে পারে না, নিজেকে মুক্ত করতে পারে না রাণীবৌ। পাশব দংশনের জ্বালা ধরে রাণীর ওষ্ঠে। কোমরে কাঁকালে ব্যথা ধ'রে যায়। চৌধুরীর মুখ থেকে তাড়ির উগ্র ঝাঁজ সহ্য করতে পারে না রাণী। রুদ্ধশ্বাসে থাকে কতক্ষণ।

বাইরের ঝর ঝর বর্ষণে শিশুর কান্না চাপা প'ড়ে যায়। একটানা বৃষ্টি আর গুরু গুরু মেঘ গর্জন। সীমান্তে মেশিনগান দেগে চ'লেছে যেন শত্রুপক্ষের গানারের দল। বিরাম-বিশ্রাম নেই, থেমেও যেন থামতে চায় না। অন্ধ-রাতের সুযোগে এলোপাতারী গুলী দাগছে অজস্র।

গম্ভীর ঘুমের মাঝে চমকে চমকে উঠেছে রাণীর ঘুমন্ত ছেলে-মেয়ে। বাঁশবনের ওপাশে আকাশস্পর্শী দেবদারুর শিখরে বাজ প'ড়েছে মধ্যরাতে! গাছের দগ্ধশীর্ষ বাতাসে উড়ে গেছে।

ভোরের আলো আকাশতীরে। ঠেলা দিয়ে উঠিয়ে দেয় কে যেন রাণীবৌকে। দুঃসংবাদ শুনে যেমন ঘুমন্ত মানুষ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে তেমনি উঠে ব'সলো রাণী। আলগা কাপড় সামলাতে থাকলো। বললে,—কি? কি হইছে?

—এই টাকা ক'টা তুই রেখে দে বৌ। কখন কি কাজে লাগে তার ঠিক কি? চৌধুরী কথা বলছে রাঙা চোখে। কথা বলতে বলতে রাণীবৌয়ের হাতে সঁপে দেয় ক'খানা কাগজের নোট, এক টাকার। বলে,—আমি যেচ্ছি পারঘাটের দিকে।

দু'দণ্ড ঘুমিয়েও শান্তি পায় না যেন চৌধুরী।

পারঘাটের ডাক কানে আসে হয়তো। খেয়া পারাপারের যাত্রীদের কলকোলাহলেই যেন ঘুমটা তার জমাট বাঁধতে পারে না। পাল পাল বন্যার্ত দিশাহারা হয়ে ডাকাডাকি করছে। শিশু আর নারীদের ভীতচকিত কণ্ঠে মুখর হয়ে আছে পারঘাট। তামা রূপা সোনা যে যা পারছে বাঁচার আশায় হাতছাড়া করছে। খেয়াপারের মাঝিদের মুঠো ভ'রে উঠছে নগদ টাকা পয়সায়। দর কষাকষি নেই, পারাপাবের মূল্যমান নেই, দর বাঁধাবাঁধি নেই! আত্মরক্ষার কাছে ধনদৌলত নগণ্য।

হাতের মুঠিতে ধরা চৌধুরীর দেওয়া ক'টা টাকা আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখলো রাণীবৌ। অসময়ে কত কাজ দেবে। শূন্য হাতে লক্ষ টাকার সামিল ঠেকে। সিক্ত ঠাণ্ডা হাওয়া চলেছে ভোরের। ভিজেভিজে শীতের দিনের কাঁপুনি লাগছে। হাতে-সেলাই একখানা কাঁথায় পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢেকে নিয়ে আবার একবার শুয়ে পড়লো রাণী। যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে ততক্ষণ যেন বেশ থাকে সে। চিন্তা নেই ঘুমের মাঝে, চোখ চাইলেই যতেক ভাবনা এসে ভীড় জমায়। মাথার ভেতরটা দপ দপ ক'রতে শুরু করে। চিন্তায় যখন কোন কূল পাওয়া যায় না তখন বুকটা আনচানিয়ে ওঠে। স্পন্দন দ্রুত হয়ে বুকের।

রাত কেটেছে অনিদ্রায়। একটানা ঘুমে ব্যাহত হয়েছে বার বার! ডেকে ডেকে টেনে টেনে তুলেছে। এটা সেটা কথা ব'লেছে কানের কাছে মুখ এনে। চৌধুরীর কাঠখোট্টা আদর আদর আর সোহাগের চোটে রাণী অস্থির হয়ে উঠেছে। আপত্তি মানতে চায় না চৌধুরী, বাধাকে তাচ্ছিল্য করে। কথা কানে তোলে না। স্বপ্ন সত্য হওয়ার আনন্দেই চৌধুরী মশগুল।

আকাশ শুভ্র হ'তেই আকাশযান হেলিকপটর আবার কখন শূন্যে ভেসেছে। যান্ত্রিক আওয়াজে বাতাস যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। বৃষ্টির পর্দা কাটতে কাটতে হেলিকপটর কত যেন ভয়ে ভয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে বিপদের এলাকায়।

ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন রাণীর কানে ছাড়া ছাড়া শব্দ ভেসে আসে। মাথা উঁচু ছুটন্ত জলের গর্জন কানে লাগে না আর, স'য়ে গেছে এই ক'দিনে। শুধু ঐ নয়াসড়কের মিছিলের কোলাহল আর্তনাদ কানে শুনলে এখনও রাণীবৌ ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। ঘরছাড়া সবহারা মানুষের দলকে দেখলে ভয় হয়। তাদের আকুল চিৎকার শুনে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

পুরুষের গলাবাজী। শিশু আর নারীর কান্না। কে যে কার কথা শোনে তার ঠিক নেই। আক্ষেপ, অভিযোগ, ভৎর্সনা সবই অকেজো হয়ে যায় মিছিলের মাঝে। পোষমানা ছাগল আর গরু জলে ভিজে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে। ভয়ার্ত পশুদের চোখে চোখে অশ্রুধারা। মানুষের মত তারাও আশ্রয়ের আশায় এগিয়ে চলেছে। মরতে চায় না, বাঁচতে চায়। মৃত্যুভয়ে কাঁদছে নীরবে।

রাণীর বাচ্ছা ক'টা ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেছে। দাওয়া থেকে আকাশে চোখ তুলে দেখছে হেলিকপ্‌টর। তাদের বিস্মিত চোখের পলক পড়ছে না যেন!

ক্যাম্প্‌ পড়েছে শহরের কাছাকাছি, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। সরকার থেকে সাহায্য বিতরণ করছে রিলিফ অফিসারের দল। ওষুধ, খাদ্য আর বস্ত্র মিলছে হাত পাতলেই। আশ্রয় মিলছে ছোট ছোট ক্যাম্পে। ডাক্তার আর মেয়ে নার্স চিকিৎসা আর সেবার কাজে লেগেছে। নার্সদের নাম কেনার চেষ্টা, জনপ্রিয় হওয়ার

আকাঙ্ক্ষা। তাদের সেবাকাজে ভেজাল নেই। আন্তরিক চেষ্টার অভাব নেই।

সারি সারি তাঁবু প'ড়েছে। দেখায় ঠিক যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে কলহ বিবাদ নেই, গেঁয়ো দলাদলি নেই। স্বার্থসিদ্ধির অপচেষ্টা নেই। সকলকে মিলিয়ে একটি সংসার সৃষ্টি হয়েছে। পর পর ভাব নেই, আত্মীয়তার সূত্রে সকলেই যেন এক!

আশ্রয়প্রার্থীদের মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টায় রিলিফের লোকেরা যেন নাজেহাল হয়ে পড়েছে। একটি স্কুলবাড়ির হলঘরে জমায়েত হয়েছে যত কিশোর-কিশোরী আর শিশু। হৈ হল্লা ভুলে গেছে তারা। গ্রামোফোনে গান শুনছে একাগ্রহে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচনা গানের রেকর্ড। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তুমি একলা চল রে—

নারী আর পুরুষের পরস্পরের দৈহিক সম্বন্ধ সম্পর্কে যাদের চেতনা সবে জেগেছে সেই সব কুমার কুমারী এখানে আর তেমন নিলর্জ্জ নয়। আড় নয়নে চাওয়া, দৃষ্টিবান হানা, কটু আর অশ্লীল মন্তব্য-ইঙ্গিত, শিষ দেওয়া, গান গাওয়া, গায়ে ধাক্কা মারা— এই সব বদ অভ্যাস, কোথায় যেন সহসা অদৃশ্য হয়েছে কোন্ মন্ত্রবলে।

হালকা ঠুনকো জীবন এখানে নেই। ক্যাম্পে ক্যাম্পে সকলেই গুরুগম্ভীর। সমস্যা সমাধানের চিন্তায়! কে কাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে তারই এক প্রতিযোগিতা চলেছে।

ক'জন প্রসূতি স্থান পেয়েছে স্কুল-বাড়ির এক দালানে। সদ্যো-জাত সন্তান একান্ত অবুঝের মত ট্যাঁ ট্যাঁ কাঁদছে পৃথিবীর আলো দেখে।

কলকাতার দৈনিক সংবাপত্রের স্টাফ ফটোগ্রাফারের দল

বন্যার্তদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে পট পট স্ন্যাপ্ তুলছে। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পাবে দুর্গতদের ছবি।

মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়া এসে ক্যাম্প্‌গুলোতে ঢেউ তুলছে। যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে জোরালো বাতাসে। ঝিরি ঝিরি বর্ষণের নাচে শব্দ খেলছে ক্যাম্পের পিঠে। ড্রাম পিটছে কারা যেন। বেতালা।

—রাণী আছিস?

দুয়োরের বাইরে থেকে এক ঝাঁজালো নারীকণ্ঠের অনুসন্ধান। যেন একজন পুরুষ মানুষ কথা কইছে।

উঠে ব'সলো রাণীবৌ। শাড়ী সামলে বললে,—হাঁ গো দিদি আছি। মরি নাই এখনও। এসো ভিত্‌রে এসো।

—ভেতরে আর ঢুকবো না। এখান থেকেই দু'টো কথা ক'য়ে কেটে পড়বো।

—কেনে গো দিদি, কি দোষ করেছি? রাণী শুধোয় উঠে দাঁড়িয়ে। বলে,—বাইরে থেকে কি কথা হয়!

দিদি এক প্রতিবেশিনী। ঘরে ঘরে ঘুরে এক কথাকে বারো কাহন রাঙিয়ে শুনিয়ে বেড়ায়। এর কথা ওর কাছে বলে। প্রকৃতিটা বেয়াড়া রকমের। কারও ভাল দেখতে পারে না। মন্দ দেখলেও কথা শোনাতে ছাড়ে না।

—হাঁরে রাণী, শুনছি তোর না কি স্বোয়ামী গিয়ে এখন খুব সুখের দিন এয়েছে!

—তাই কি হয় দিদি। এই কি কথা! রাণী ক্ষুণ্নমনে কথা বলে। দুয়োরের কাছে এগিয়ে যায় সলজ্জায়।

—যেমন শুনছি তেমন বলছি। মিথ্যে কথা বলবো কেনে! তোর ঘরে নাকি মোচ্ছব লেগেছে?

কথা শুনে হতাশ হাসি হাসলো রাণীবৌ। চোখে চাপা বিরক্তি। ঈষৎ রাগে কপালে রেখা ফুটেছে। রাণী বললে,—পোড়াকপাল আমার!

—যাই হোক, আমি তো বিশ্বেস করি না! যা শুনেছি তাই বলছি।

—লোকে এমন কত কথা বলে। রাণী বললে ছলছল চোখে।

—লোকের মুখ বন্ধ করতে পারবি তুই? তেমন সাধ্যি আছে?

—না দিদি, তেমন সাধ্যি আমার নেই।

—তবে তো ভালমানুষের মেয়েকে লোকনিন্দে শুনতে হবে।

—বরাতে এখনও কত কি আছে কে জানে!

আগন্তুক প্রতিবেশিনী হঠাৎ রাণীর কাছে এগিয়ে আসে। চুপি চুপি বলে,—সুযোগ সুবিধে হেলায় নষ্ট করে না কেউ! আমার কথা যদি রাখতিস, সব দিক বজায় থাকতো।

—তোমার কথাটি কি তাই শুনি। রাণীর কথায় আকুল আগ্রহ। চোখে বিস্ময় জিজ্ঞাসা।

—চালকলের সাহাবাবুদের হাত-তোলায় থাকবি তুই? খাওয়া পরা দেবে, নগদ টাকা-পয়সা পাবি। সাধ-আহ্লাদ রক্ষে করবে বাবুরা। কোথা থেকে দিন চলবে ভাবতে হবে না তোকে, রাণীর হালে থাকবি।

চোখ দু'টিকে বন্ধ করলো রাণীবৌ। খানিক নিশ্চুপ থেকে বললে—, কি যে বল দিদি! লোকে নিন্দে করবে না?

—সেটা তুই আমার ওপর ছেড়ে দে। খ্যাংরা মেরে লোকের মুখ বন্ধ করবো আমি। ভয় কি তোর আমি যখন আছি?

এপাশে ওপাশে মাথা দোলায় রাণীবৌ। অসম্মতি জানায়। বলে,—না দিদি, তোমার কথা রাখতে পারবো নাই। সাধ-আহ্লাদ কিছু আছে কি? মরতে চলেছি যে।

স্থূলবপু নাচিয়ে নাচিয়ে হায়নার মত হা হা হেসে উঠলো দিদি। হাসির জের টেনে বললে,—আর হাসিও না বৌ। তোমার এখন কাঁচা বয়েস, সবে যৌবনে পা দিয়েছো। সাহাবাবুদের হাতে থাকলে এ জীবনে আর কোন দুঃখু থাকবে না, হলপ ক'রে বলতে পারি! মাসিক হাত-খরচা দেবে বাবুরা। পালা-পার্বণে গয়না কাপড় দেবে।

আবার সেই রকম হতাশ হাসি হাসলো রাণীবৌ। বললে,—কিছু চাই না আমার। বেশ আছি আমি! খানিক থেমে আবার বললে,—সাহাবাবুরা তোমাকে পাঠিয়েছে না কি?

—হ্যাঁ রে বৌ। সাহাবাবুদের নজর প'ড়েছে তোর দিকে। আমাকে ধরাকরা করছে। তোর কাছে পাঠিয়েছে কথা পাড়তে। তুই আর ওজর-আপত্তি তুলিস না। রাজী হ'য়ে যা। বরাত তোর খুলে যাবে। সংসারে হাসি ফুটবে।

—ক্ষেমা কর' দিদি। এ সব কথা যেতে দাও।

—তোর জেদ তো কম নয় বৌ!

কথার উত্তর দেয় না রাণীবৌ। শুষ্কহাসির প্রলেপ পড়ে মুখে। আপত্তির ইঙ্গিতে ঠোঁট ওলটায়।

প্রতিবেশিনী আশাহত হয়। নিষ্ফল চেষ্টায় কেমন দ'মে যায় যেন। উদ্দেশ্য কাজে লাগলো না। বললে,—এই বিষ্টি-বাদলায় এসে ফিরে যেতে হবে বৌ? কষ্টই সার হবে আমার? আমাকে ফিরিয়ে দিবি?

মৃদু মৃদু করুণ হাসির সঙ্গে রাণীবৌ বললে,—উপায় নেই

দিদি। খোলাখুলি যেতে পারবো না বেপথে। অনেক বাধা আছে।

—সাহাবাবুদের কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না। কথা রাখলি না তুই।

—ভেসে যেতে পারবো না আমি। আমার ঐ বাচ্ছা ক'টাকে বাঁচিয়ে মানুষ করতে হবে। ওদের কি গতি হবে, আমি যদি ভেসে যাই স্বৈরিণীর মত ?

অনেক দায় আর দায়িত্ব আছে এখনও। রাণী আবার গম্ভীর হয়ে পড়ে। সোনালী সুযোগ হেলায় হারাতে চলেছে সে। ছেলে মেয়ে না থাকলে এক কথায় ঝাঁপ দিতে পারতো আগুনে। আতস-বাজীর মত জ্বলতে জ্বলতে অনেক উঁচুতে উঠে ফুরিয়ে গিয়ে অন্যের আনন্দের খোরাক জোগাতে পারতো রাণীবৌ। অঢেল সুখ আর স্বস্তিতে বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দিয়ে সত্যিই হয়তো রাণীর আদরে মরতে পারতো রাণীবৌ। পিছটান না থাকলে যেতে পারতো যেখানে খুশী ; যার কাছে ইচ্ছা তার কাছে।

চার জোড়া চোখের অসহায় চাউনি রাণীর চোখের সমুখে ভেসে ওঠে। আশ্বাস চায় ওরা, বাঁচতে চায় মানুষের মত। পৃথিবীতে ওদের আপন ব'লতে আর কেউ নেই, এক মা ছাড়া। ওরা নির্দোষ, নিষ্পাপ, নির্ভেজাল। খাদ নেই এতটুকু। যত দোষ রাণীবৌয়ের, যত অপরাধ তারই। রাণী ওদের পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে, এই এক মাত্র দোষ।

একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো দিদি। বললে,—তবে আর বৃথা কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। নিজের পথ দেখি।

দুঃখকাতর হাসি ফুটলো রাণীর মুখে। বললে,—লাভ নাই, শুধুই লোকসান। কোন উপায় নাই।

দাওয়ার মাটির দেওয়ালে ঠেকিয়ে রাখা টোকা মাথায় তুলে নেয় প্রতিবেশী দিদি। পিছু ফিরে গজেন্দ্রগমনে চলতে চলতে দাওয়া থেকে নেমে পড়ে জলকর্দমে। খানিক এগিয়ে শেষবারের মত বলে, —বৌ, আর একবার ভেবে দেখিস্ ব্যাপারটা। মন মানলে ডাকবি আমাকে। আবার আসবো।

চোখে জ্বালা ধরে যেন! রাণীবৌ আঁচলে চোখ মুছলো। সোনার সুযোগ স্বেচ্ছায় হারালো সে। ফুল আর কাঁটা দুইয়ের মধ্যে কাঁটা বেছে নেয় রাণী। চাই না ফুলের সুবাস, রঙের বাহার —কষ্টকাঁটা, তাই সই।

উনানে আগুন দিতে হবে। ভাতের হাঁড়ী চাপাতে হবে। চৌধুরীর দেওয়া চাল আছে আরও কয়েক মুঠি। সযত্নে তেকাঠায় রেখে দিয়েছে রাণীবৌ। তার ছেলেমেয়ের একমাত্র খাদ্য। তাদের দেহধারণের অদ্বিতীয় সারবস্তু—চালভাত।

দুয়োরে অর্গল তুলে দেয় রাণী। বাচ্ছাদের ঘরে ডেকে নেয়। শিশুকে বুকে তুলে রসুইয়ের দিকে চলে ক্লান্ত পায়ে। নিজেকে কেমন অবসন্ন লাগছে যেন। ছাড়া ছাড়া ঘুমের জড়তায় এখনও ঘুম নামছে চোখে। কপালের দুই তীর দপদপ করছে রাতের বিনিদ্রায়। চৌধুরীর বাহুপীড়নের ক্ষীণ ব্যথা অনুভব করছে বুকে পিঠে। অধর জ্বলছে এখনও।

চোখে মুখে জল ছিটিয়ে নেয় রাণী। ইঁদারার ধারে গিয়ে দাঁতে ছাই ঘষে। চৌধুরীর মুখ থেকে তাড়ীর বিকট একটা গন্ধ রাণীর মুখে সংক্রমিত হয়েছে। নাকে অসহ্য ঠেকলেও মুখ ফুটে প্রতিবাদ জানাতে পারেনি রাণী। শ্বাস নেয়নি কতক্ষণ।

শীত শীত হাওয়া চলেছে দিক ভুলে। রাণীর আলুলায়িত কেশের বোঝা উড়ছে এলোমেলো। রসুই ঘরে কাঁদছে শিশু। মাকে দেখতে

না পেয়ে চিৎকার করছে পরিত্রাহি। হয়তো ক্ষুধার্ত হয়েছে। তাই হাত চালায় রাণী। রুখু চুলের বোঝায় জল ঢালতে থাকে। কলসী উলটে দেয় মাথায়। রাত্রির অবসাদ ঘুচিয়ে নেয় যেন, ইদারার ঠাণ্ডা জলে। শান্তিস্নানে।

রসুই থেকে ধোঁয়া উঠছে এঁকে বেঁকে। ধরানো উনুনের ধোঁয়া, বাতাসে উড়তে উড়তে বৃষ্টিজলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ধীরে ধীরে।

বর্ষার বিপুল বেগ ইষৎ যেন শান্ত হয়েছে, সকালের আবছা আলোয়। ক'দিন পরে আজ আকাশের পুবতীরে সূর্য-আলোর ইসারা খেলছে। আলোর ঝিকিমিকিতে হীরার দ্যুতি। রূপালী রেখার আবর্ত্তনে ঘনলাল মহাদ্যুতি। আবার হয়তো এখনই রাশি রাশি কালো মেঘ উড়ে আসবে গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের মোহানা থেকে। উড়ে আসবে আর জমাট বাঁধবে। তখন আবার কৃষ্ণ-যবনিকায় ঢাকা পড়বে আকাশমঞ্চ। উদ্দাম ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি ঝরবে মেঘপুঞ্জ থেকে।

আশে পাশে চোখ পড়ে। নজর চালিয়ে চালিয়ে এই প্রথম দেখলো যেন রাণীবৌ। গাছের শুষ্কশাখায় কচি সবুজ পাতা। ফাটধরা মাটিতে সবুজ ঘাস মাথা তুলেছে। ধূলিমলিন তাল আর নারকেলের চূড়া-শিখরে টাট্‌কা সবুজের ছোঁয়া লেগেছে।

শিশু কাঁদছে রসুই ঘরে। রাণীবৌ মাতৃস্নেহে অধীর হয়ে ছুটে এসে ভিজে কাপড়ে তুলে নেয় তাকে। তেকাঠা থেকে মিছরিদানার শিশিটা নামিয়ে শিশুর মুখে দেয় কয়েক টুকরো। কান্না থামানোর মিষ্টি ওষুধ।

আবার কড়া ঝনঝনিয়ে উঠলো বার-দুয়োরে। উপরি উপরি আঘাত পড়ছে কপাটে। বাচ্ছাগুলো চমকে চমকে উঠছে।

—কে ?

ভেতর থেকে সাড়া দেয় রাণীবৌ। ভয়ে ভয়ে। আবার কে এলো কে জানে। কি প্রস্তাব এনেছে হয়তো একটা, গ্রহণের অযোগ্য। সাহাবাবুরা হয়তো অন্য কাকেও পাঠালো বেগতিক দেখে। চাপা এক রাগে মুখে যেন বিরক্তি ফুটেছে রাণীবৌয়ের। ঠোঁট কামড়ে ধরেছে রাগের বশে।

—কে ? সাড়া দাও না কেনে ?

কথা বললে রাণী। একটু যেন জোরালো স্বরে।

—খুলো মাগী, দরবাজা খুলো। হাম তেরি বাপ হায়।

রাষ্ট্রভাষায় কথা বলছে যেন। হিন্দী ভাষাভাষীর অসভ্য কণ্ঠস্বর নেচে উঠলো বাইরের দাওয়ায়।

কপাল দপদপিয়ে ওঠে অপমান, অসম্মানের রাগে। রাণীবৌ দুয়োর খুলে একপাশে স'রে দাঁড়ায়।

কোতরং থেকে জমাদার এসেছে দু'জন। হাতে লাঠি। মাথায় লাল পাগড়ী। গায়ে খাকির কোট-জামা। নিকেলের বোতামে আর কোমরের বেল্টের তকমায় অশোকস্তম্ভ। 'সত্যমেব জয়তে' লেখা সংস্কৃত অক্ষরে।

—তোর ঘরে দাগী আসামী আছে। ঘর তল্লাসী হোবে।

কথা বলতে বলতে দু'জনে ভেতরে ঢুকলো। ভিজে বুটের মচ-মচানী শুনে বাচ্ছাগুলো পালিয়ে যায় চোখের আড়ালে।

শিউরে উঠলো রাণীবৌ। ভয়-কাঠ গলায় বললে,—কেউ নাই আমার ঘরে। আমি আর আমার ছেলেমেয়ে আছে। তারা চোর ছ্যাঁচোর নয়।

কথায় কর্ণপাত করে না জমাদার। এ ঘরে সে ঘরে ঢুকে পড়ে আপন খেয়ালে। ইদিকসিদিক দেখে। তক্তাপোষের তলায় চোখ

চালায়। ডেয়ো-ঢাকনা ফেলে ছড়ায়। বাক্স-প্যাঁটরা তোলাপাড়া করে। নিরাশ হয় খুবই, তবুও জেদ ধ'রে থাকে। আদালতের ম্যাজিষ্ট্রেটের মত জেরা করতে শুরু করে।

—চোট্টা-বদমাস লোগ তেরি ঘরমে আতা হায় ?

অস্বীকার করে রাণীবৌ। সরাসরি বলে,—না না কেউ আসে না। ঘরের মানুষ বানের জলে ভেসে গেছে।

—চোপ রও মাগী। দিললাগী মৎ করো। সাচ্ বাত বল।

এক জমাদারের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরে রাণী কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

—সত্যি কথা বলছি, কেউ আসে না। কেউ নাই আমার। রাণীবৌ কথা বলছে প্রতিবাদের ভঙ্গীতে। বিরক্ত আর বিব্রত হয়েছে সে। অপমান ভুলতে পারে না যেন। অব্যক্ত রাগে পা দু'টি তার কাঁপছে। ইচ্ছা হয় ওদের দু'জনের গালে ঠাস ঠাস চড় কষিয়ে দেয়।

যেমন আকৃতি তেমনি প্রকৃতি জমাদার দু'জনের। পশুর মত চোখের চাউনি, ইঁদুরের মত ভাবভঙ্গী; উটকো কথার ধরন।

—চোরাই চাল আছে ঘরে? আবার প্রশ্ন করলে ওদের একজন। বললে, কাঁহাসে মিলছে, বোল্ মাগী বোল্।

কথা বলতে বলতে ওরা হাঁড়ী-কলসী ফেলে ছড়ায়। এটা সেটা নাড়াচাড়া করে। ঝুলানো শিকা ধ'রে টানাটানি করে। এক কণা চাল মেলে না কোথাও। শুধুই নিরাশা।

কথা সরে না মুখে। কেমন এক রুদ্ধ কণ্ঠে রাণী বললে,—এক কণা চাল নাই আমার ঘরে। থাকলে কি আমার বাচ্ছাদের এমন হাল হয়। চাল কোথায় পাবো আমরা! কে দেবে! মিথ্যে মিথ্যে জুলুম কর' কেনে?

—সাচ বাৎ বলছিস তুই ?

—হাঁ গো হাঁ। মিথ্যে বলতে যাবো কেনে !

জমাদার হু'জন হতাশায় ভেঙে পড়লো যেন। ঘর থেকে দাওয়ায় বেরিয়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করে। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে দাওয়া থেকে নেমে যায়। থানার অভিযোগ, পুলিসের সন্দেহকে উড়িয়ে দিয়েছে রাণীবৌ। শক্ত সমর্থ হু'জনকে হটিয়ে দিয়েছে অস্বীকারের জোরে।

ভাগ্য ভাল যে চৌধুরী, লক্ষ্মণ সামন্ত, জোসেফ—কেউ এখন নেই এখানে। একজন কেউ থাকলেও বিরাট রকমের একটা দল ধরা পড়তো পুলিসের হাতে। জোসেফ, আর চৌধুরীকে স্থানীয় পুলিস ভালোভাবেই চেনে জানে। পুলিসের নালিশ-খাতায় ওদের হু'জনের নামে অনেক অভিযোগ লেখা আছে। লক্ষ্মণ সামন্তই শুধু নতুন ভিড়েছে এই দলে। দুর্নামটা তেমন ছড়ায়নি এখনও।

ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হয় রাণীর। বরাতে এখনও কত কি আছে কে বলতে পারে ! মনে মনে পুলিস-বিভাগকে শাপমন্যি দেয় সে। বিড় বিড় বকতে বকতে গালমন্দ করে। নিজের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে পুলিসী আতঙ্ক আসে মনে। আবার কখন আসবে পুলিসের জমাদার। আসবে অপমান করতে। কথা শোনাতে। তল্লাসী চালাতে—চোর আর চালের সন্ধানে।

জ্বলন্ত উনানে চালসমেত ভাতের হাঁড়ীটা চাপিয়ে দিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকে রাণীবৌ। ক'টা আলু আর পটল ভাসিয়ে দেয় হাঁড়ীতে। ভাতে ভাত চাপিয়ে দেয়। বাচ্চাগুলো চোখে পড়তেই ক্রোধান্ধ হয়ে ওঠে। বলে,—মর্‌না তোরা একটা একটা। তোদের তরেই যতেক বিপদ আমার ! ভাত ছাড়া কিছু মুখে তুলবি না তোরা !

ওদের ম্লান মুখ মূক হয়ে থাকে। চোখের পলক পড়ে না। অতশত বোঝে না ওরা। রাণীর রাগের কারণ ঠাওরাতে পারে না। তাদের মাকে এমন উন্মাদিনীর রূপে দেখে ভয় পায় ভীষণ। মার সমুখ থেকে চলে যায় অন্যত্র, পা টিপে টিপে। ভাত খাওয়ার জন্য কি যে এমন রাগের কারণ থাকতে পারে, অনুমানে বুঝতে পারে না।

চোখ ফেটে জল ঝরে। রাণী আপন মনে খানিক কেঁদে নেয় চুপিসাড়ে। পুলিসের অপমানের কথা কিছুতেই যেন ভুলতে পারে না। কালীচরণ ঘরে থাকলে একবার দেখিয়ে দিতো রাণী। কড়া কথা শোনাতে পারতো। অপমান ফিরিয়ে দিতে পারতো। এমন মুখ বুঁজে সহ্য করত না কখনও।

কালীচরণের অকাল বিয়োগে দুঃখের পরিবর্তে রাগ হয় রাণীর। কেমন অসহণীয় ঠেকছে সব কিছু। যে যায় সে না কি আর ফেরে না। তবে কেন একলা গেল কালীচরণ! পেছনে ফেলে গেল কেন তার উত্তরাধিকারীদের—যাদের মুখে গ্রাস যোগাতে রাণীর জান নাকাল হ'তে বসেছে! অশ্রুধারা নেমেছে রাণীর চোখ থেকে। নদী নালার বান নয়, অশ্রুবন্যা—বাঁধ মানে না কখনও!

পৃথিবী ঐশ্বর্যশালিনী, দেখলে কে বলবে! কে বলবে রত্নাকর!

সাজানো গোছানো বিশ্ব-সংসার মানুষের রচনা। কখন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিত্ত আর বৈভবের সামগ্রী, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা অন্য একটা বিকট রূপ নেয়, কেউ বলতে পারে না। সভ্য মানুষের দর্প-অহঙ্কার ধূলিসাৎ হয়ে যায় রাতারাতি। বীর বীরাঙ্গনার ক্ষমতা নেই, ঝড়ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্পন, দাবানলকে প্রতিরোধ করবে। তাই

হয়তো চিরকাল প্রকৃতির কাছে নরদেহীর পরাজয় হয়েছে। আজ যেখানে সুসমৃদ্ধ জনপদ, জনাকীর্ণ লোকালয়, আগামী দিনে সেখানে হয়তো দেখা যায় শূন্য প্রান্তর, শ্মশানভূমি।

ঝড় বৃষ্টি আর বন্যাজলে ওলট-পালট হয়ে গেছে বিলকুল। মানুষের বসতি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। জনপ্রাণী নেই কোথাও, খাঁ-খাঁ চতুর্দিক। থৈ-থৈ জলের বিছানো ফরাস যেন সোনালী রঙের। তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস নেই আর, উদ্দাম বেগ ধীরে ধীরে কখন শান্ত হয়েছে। শুধু ছোট বড় ঘূর্ণী ঘুরছে এখানে সেখানে। জলের ডাকে, গম্ভীর সামুদ্রিক গর্জনে ভাঁটা পড়েছে। তীব্রগতি বন্যাধারা অবিশ্রান্ত ছুটে ছুটে হাঁফিয়ে উঠেছে। নির্লজ্জ এক প্রগলভার যৌবনকাল যেন গত হয়েছে। তাই ক্লান্ত স্তিমিত। আকাশ আর ডাকছে না যখন তখন। বিজলীর শক্তি ফুরিয়ে নিঃশেষ এখন। ঝলক খেলছে না আর।

ঝিরি ঝিরি বর্ষণ এখনও যা থেমেও থামতে চাইছে না। সাদা সাদা পুঁতির মত বৃষ্টির গুঁড়ি।

মুঠো মুঠো হীরার কুচি যেন আকাশ থেকে ঝরে। দিকভোলা এলোমেলো ববফঠাণ্ডা বাতাসে এখনও ঝড়ের রেশ। সোঁ-সোঁ শব্দে ক্ষ্যাপাটে হাওয়া চলেছে। বাদল-আকাশ বিরাম-বিরতি মানতে চায় না।

জল আর আকাশ একাকার। দিগন্ত দেখা যায় না দূর-বীক্ষণেও। ঘোলাটে জলের বুকে ভাসছে শব আর খড়ের চালা; নৌকার তক্তা, ভাঙা হাল, হাঁড়ী-কলসী। একটা মরা গরু ভেসে চলেছে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে। নিঃসাড় দেহে আশ্রয় নিয়েছে ক'টা দাঁড়-কাক। ঠুকরে চলেছে অবিরত। মাথা উঁচু গাছের শিখর যেন ঠিক সবুজ পাহাড়। মাথা তুলেছে একটা একটা। গাছের শাখায়

শাখায় সরীসৃপ ; জল থেকে আত্মরক্ষার আশায় নিরাপদে বাসা বেঁধেছে। সাপ, গিরগিটি, আর বহুরূপী। সাপের মুখে ধরা পড়েছে বাদুড়ের ছানা। মুখরোচক সুখাদ্য এক। পরিত্রাহি ডাকছে মরতে মরতে।

থৈ-থৈ জলের সোনা-রঙ ফরাসে বৈকালিক আকাশের প্রতিচ্ছায়া ঝিলমিল করছে। জলে যেন রাঙা আলতার আভা ছড়ানো। সিঁদুর মেঘের ছায়া পশ্চিম আকাশে। অদৃশ্য সূর্য মন্থরগতিতে অচলে নামছে।

পারাপারের যাত্রী নেই বললেই হয় পারঘাটে। দড়ি-বাঁধা পানসী, ডিঙী আর গহনা নৌকাগুলো শূন্য এখন। জলের দোলায় দুলছে আড়াআড়ি। যেন কালো কুমীরের দল, জল থেকে উঠে জিরেন নেয় লেজ ডুবিয়ে। বটের পাখীর ঝাঁক, সারি দিয়ে বসেছে পানসী আর ডিঙীতে। আসন্ন কালো রাত্রে কোথায় যে নির্ভর আশ্রয় মিলবে। ধ্বসে পড়া পলিমাটির পর্বতপ্রমাণ স্তূপ জলের তীরে ; চড়া পড়েছে চাঁই চাঁই মাটির। ক'টা শবদেহ ভাসতে ভাসতে আটক পড়েছে চড়ায়। বিধ্বংসী বন্যায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে হার মেনেছে অবশেষে। চিল আর শকুন ঘিরেছে। বনভোজনের পর্ব লেগেছে যেন জলের ধারে। বাতাস বিষিয়ে উঠেছে দুর্গন্ধে।

ক'খানা পরিত্যক্ত ভগ্নপ্রায় বজরার ঘরে ঘরে আড্ডা জমিয়েছে যতেক মাঝি-মাল্লা খেয়াঘাটের। গাঁজা আর তামাকের ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরগুলো। বাক-বিতণ্ডা চলেছে, শলা-পরামর্শ চলেছে। ঘাটের কাছাকাছি উঁচু জমিতে খান তিনেক টিনের চালা। আক-ঢাক নেই, দুয়োর-জানালা নেই, কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে বাঁশের বাঁধনে।

ছাউনির তলায় খানকয়েক দোকান। পান, বিড়ি, তামাক; চা আর সোডাজল; দড়ি-দড়া বাঁশ-বাখারী; তেলেভাজা ফুলুরী সিঙাড়া বিকিকিনি হয়।

কলসী কলসী তাড়ী গিলছে মাঝি-মাল্লারা। বজরার ঘরে ঘরে ভাজা ফুলুরী, তাড়ীর সঙ্গে হৈ-হল্লা হাসি-তামাসার ফোয়ারা ছুটছে। তাস পাশা খেলছে ছোকরার দল। পাই পয়সার রেট্ ধ'রে জুয়া খেলছে খোলাখুলি।

পারাপারের যাত্রী নেই, ঘাট-বদল করতে হবে অচিরাৎ। নয়তো লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যাবে। রোজগারের ব্যবস্থা চাই, রুজী চাই। নয়তো গাঁটের কড়িতে হাত পড়বে। এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে তরী না ভিড়ালেই নয়।

—জামীরার ঘটে যাই চল'। কেউ কেউ বলছে।

প্রবল আপত্তির প্রতিবাদ কোলাহল ওঠে। না না জানিয়ে দেয় অনেকে।

—তবে চল' কেনে মালঞ্চর ঘাটে। মানুষের আনাযানা হাছে সেখানে। ব্যবসাটা-বাণিজ্যটা চলতেছে। মাল-মসলার আমদানী আছে। সায়েবের পাটকলগুলা আছে, ভাবনার কি আছে?

—মালঞ্চর গোটা মাল্লা সমাজটা যে বেবাক বদলে গিয়েছে। তাদের সনে পাল্লা দিতে পারমু কেমনে? লাল পতাকার দলে নাম লিখায়ে তারা এখন একটা একটা কেউকেটা হয়ে উঠেছে।

—লাল পতাকা। বিস্ময়ের ঘোর নামলো কারও কারও মুখে। —সেটা কি বস্তু?

—যারে কয় লালঝাণ্ডা?

—হাঁ গো হাঁ। ঠিক তাই। ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা।

—তা তোমাগোর লালঝাণ্ডার দল কি বলে? তাদের মতা-মতটা কি তাই শুনি?

রূপকথার গল্প শোনানোর মত বলতে হয় বুঝিয়ে সমজিয়ে। হট্টমেলার দেশে এক রাজা আছেন। নবাব বললেই ভাল শোনায়। অর্ধেক ভারত জুড়ে রাজত্ব, প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী এই নবাব দিনরাত তাঁর হারেমেই প'ড়ে থাকেন। রাজশাসন দেখবেন তেমন ফুরসৎ কৈ? নবাবের খানা আসে দেশ দেশান্তর থেকে। কাবুল থেকে আখরোট বাদাম আসে; কাশ্মীর থেকে আপেল আঙুর আসে; সিমলা থেকে কমলালেবু আসে। বাবুর্চির দল মুরগী জবাই ক'রে পোলাও বানিয়ে দেয় পেশোয়ারী চালের। স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স থেকে উড়োজাহাজে আসে নবাবের শরাপ। হারেমে দুনিয়ার বাছাই করা সুন্দরী। দিন যায় দিন যায়। হঠাৎ এক সকালে উঠে নবাব তাঁর হারেমের অলিন্দ থেকে দেখলেন দূরবীনে, দূরে দিগন্তে দরিদ্র-পল্লীর মাথায় একখানা ছেঁড়া লালপতাকা উড়ছে। নবাব তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের ডাক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বললে,—হুজুরের হুজুর, যাদের কিছু নেই, যারা সর্বহারা, তারা তাদের বুকের রক্তে রাঙিয়ে রাঙিয়ে ঐ লাল-পতাকা ওড়ায়।

নবাব গোঁফে পাক দিতে দিতে বললেন,—যাক, ওদের তবে কিছুই নেই?

—না হুজুর, কিছু নেই, সব ফক্কা। ওরা নিজেরা আছে শুধু। ওরা সকলে এক।

পরম নিশ্চিন্তায় রাজা আবার হারেমে গিয়ে বসলেন। যাওয়ার আগে বললেন,—আমি তো একাই একশো।

—একশো নয় হুজুর, এক কোটি বলতে পারেন!

যাই হোক, মাঝি-মাল্লাদের মাঝে বাক-বিতণ্ডা চলতে থাকে। ঘাট-বদল করতে হবে, নয়তো পুঁজিতে হাত পড়বে। কলসীর জল গড়িয়ে গড়িয়ে কতদিন খাবে আর।

—মালঞ্চর ঘাটেই চল। সর্দার-মাঝি শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। বলে,—পেটের খাওয়া না জুটলে মরতে হবে সব।

—পুব-বাঙলার বাস্তুহারা জেলে-মাঝিদের হাতে এখন মালঞ্চর ঘাট। আমাগোর পাত্তা মিলবে না সেখানে। তারাই লাল পতাকা উড়িয়েছে।

—পুব পছিম বলতে কিছু নাই। লাল সাদা বলতে কিছু নাই। আমরা সকলেই এক। ছুনিয়ার মাঝি-মাল্লা এক। সব এক হো যায়েগা।

সম্মতি জানায় প্রায় অধিকাংশ। আগে বাঁচতে হবে, মুখের গ্রাস জোগাড় করতে হবে। আপনি বাঁচলে তবে বাপের নাম রক্ষা হবে।

যেন রণে ভঙ্গ দেয় মাঝির দল। বজরায় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। যে যার নৌকার দিকে দৌড়য়। সাঁঝের আগে যাত্রা করতে হবে। মালঞ্চর ঘাটে যেতে যেতে যার নাম সেই মধ্যরাত। উজানের বিপরীত হাল চালাতে হবে। জল কাটতে কাটতে যেতে হবে।

তেলেভাজার দোকানউলী বেশ ডাগর-ডোগর। তেজে যেন মট মট করছে। গায়ের গতর খুব, একাই দোকান সামলায়। উনানের সামনে আর এক জ্বলন্ত আগুনের মত দোকানউলীকে দেখে সবাই ডরায়। কাছে এগোতে সাহস পায় না। আপন পরাক্রমে দেহ-হরণের চোরা আসামীদের ঠেকিয়ে রেখেছে। দোকানীর নাম সোরাগসুন্দরী। এই নামেই খোদ সরকার থেকে দোকান জমা নেওয়া আছে।

সবাই জানে, কোতরং-এর কে এক দারোগাবাবুর সঙ্গে সোয়াগীর পিরীত আছে। তাই সদাই যেন বুক চিতিয়ে থাকে সোয়াগী। কাকেও তোয়াক্কা করে না। কথায় কথায় ঝাঁটা লাথি তোলে।

জোসেফ শুধু তুচ্ছ জ্ঞান করে দারোগা পুলিসকে। হেসে উড়িয়ে দেয়। থুথু ফেলে পুলিসের নামে। তবে হ্যাঁ কোনদিনের তরেও সোয়াগীর দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকায় না জোসেফ। খাসদখলে যে আসবে না তাকে চায় না সে। তার দিকে চায় না। তবু ফষ্টিনষ্টি করতেও ছাড়ে না।

পারঘাটে আজ যেন বিরহ নেমেছে।

ঘাট-বদল করতে হবে, লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে। মাঝি-মাল্লার দল পয়সা মিটিয়ে দিতে আসে। বকেয়া পাওনা শোধ ক'রে দেয়।

—বলি এই সোয়াগী, তোর গতিটা কি হবে তাই শুনি।

ঝড়োকাকের মত কোথা থেকে আসে জোসেফ। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে। চক্ষু তার রক্তবর্ণ। প্রায় আধ কলসী তাড়ী খানিক আগে জোসেফ শেষ ক'রেছে। নেশা ধ'রেছে হয়তো। কথায় জড়তা, অস্পষ্টতা। বললে,—পাততাড়ি গুটিয়ে ফ্যাল্। খদ্দের মিলবেনি আর।

হাসলো সোয়াগী, মিষ্টি মিষ্টি। তার কপালের কাচপোকার সবুজ টিপ ঝিলিক তুললো বিদ্যুৎ-বিন্দুর মত। তৈলাক্ত ঘর্মাক্ত মুখখানা নীলাম্বর শাড়ীর আঁচলে মুছতে মুছতে বললে,—ভেবে তো কুলকিনারা পাই না। বরাতে এখন কি আছে ভগবান জানে।

—মালঞ্চর ঘাটে তুই চল্ না কেনে। জোসেফ কেমন কাঙালা-মির সুরে কথা বলছে। একটা ভাঙা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে

ব'সলো জ্বলন্ত উনানের কাছাকাছি। বললে,—চল আমাগোর পিছু পিছু, দোকান খুলবি তুই।

—হুট বললেই কি যাওয়া যায়! কড়াই থেকে এক ঝাঁজরা ফুলুরী চুবড়িতে ঢালে আর বলে সোয়াগী। আক্ষেপের সুরে। বললে,—ঘরদোর ফেলে অত দূরে যাওয়া কি মুখের কথা! দেখবে কে আমাকে? থাকবো কোথায়? তেমন আস্তানা কৈ?

কথার সুর নামায় জোসেফ। একটা চোখ ঈষৎ বুঁজে ফেলে। কথায় হাসি মাখিয়ে বললে,—তোর দারোগাবাবু থাকতে আবার ভাবনা কি!

হেসে উঠলো সোয়াগী। খিল খিল হাসির ঢেউ তুললো বুকে কাঁকালে। কত যেন খুশী হয়েছে সে, তবুও মুখে নকল বিরক্তি। লোক দেখানো বিরক্তি। বললে,—তুমার মুখটার কি কোন আখঢাক নাই?

জোসেফের কথার সুর আরও মিহি হয়। হাসির বেগ সামলে বললে,—লোকে কথায় বলে মাছ খাবি তো ইলিশ আর—

—থাক ঢের হয়েছে। আর বলতে হবে না। সোয়াগী ঠোঁট উল্টে উল্টে বললে। কথার মধ্য পথে জোসেফের মুখের কথা থামিয়ে দেয়।

—দাও একটা পান দাও, খাই। কথার শেষে সহাস্যে হাত পাতলো জোসেফ। বললে,—সোয়াগীদিদি না থাকলে ঘাট মানাবে কেনে? ফাঁকা ফাঁকা ঠেকবে আমাগোর। মুখে হাসি ফুটবেনি।

হেসে নেয় সোয়াগী। চাপা আর লুকানো হাসি। বললে,—বাসি পান আমার, মনে ধরবেনি তুমার। ভাল লাগবোন।

অট্টহাসি ধরলো জোসেফ। হো হো শব্দে হাসলো ঘাট কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে। এক নাগাড়ে হাসতে হাসতে হঠাৎ থ মেরে

যায় নেশার আধিক্যে। ক্ষণেকের মধ্যে কেমন অসম্ভব গম্ভীর হয়ে ওঠে। অন্যমনা হয় যেন। পারঘাটের দিকে তাকিয়ে থাকে এক-দৃষ্টে। ঘাটের ক'খানা কাঠের পৈঠা, বেনো জলে ভেসে গেছে। কোদাল-খোঁড়া ধাপ ক'টা বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। সাময়িক।

নিশ্চুপ থাকতে থাকতে জোসেফ হঠাৎ আবার উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। টলটল শরীরটা তার অধিকক্ষণ সোজা থাকতে পারে না। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে,—বাকী পয়সা ক'টা মিটিয়ে লাও সোয়াগী-সুন্দরী। মিটিয়ে দিই। কত বাকী আমার?

ভাবলো না এক পল। সোয়াগী মুখে মুখে জবাব দেয়। বলে,—সাড়ে তেরো আনা হইছে আজ লিয়ে। দাও পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে দাও ভাল মানুষের মত।

কোমরের ট্যাঁকের পাক খুলতে থাকে জোসেফ। খুচরো পয়সা বের ক'রলো মুঠোখানেক। বেছে বেছে দেখে দেখে প্রাপ্য দিয়ে দেয় জোসেফ! এত প্রবল নেশা, কিন্তু হিসাব ভুল করে না। বেশীও নয়, কমও নয়, যথার্থ দিয়ে দেয়।

আঁটসাঁট লাল আলপাখার খাটো জামার কোঁকরে সোহাগী ঢুকিয়ে দেয় রেজগী পয়সা। নিজস্ব ব্যাঙ্কে রাখে যেন। গচ্ছিৎ রাখে যেন হারানোর ভয়ে।

—জোসেফ ভাই। মাঝিদের ভীড় থেকে আকুল আহ্বান আসে।

চেনা চেনা স্বর, তবু যেন ঠিক ঠাওরাতে পারছে না জোসেফ। ভুল শুনছে না কি সে! নেশাতুর লাল চোখের দৃষ্টি ঘোরায় ইদিক সিদিক। চেঁচিয়ে সাড়া দেয়। বলে,—কে? সামন্তর পো না কি?

—হাঁ গো হাঁ। কথা আছে। ইদিকে আও না।

নেশা ধরছে জোসেফের। পা টলছে। চোখের চাউনি স্থির থাকছে না। টলতে টলতে এগিয়ে চললো জোসেফ। এখানে সেখানে পা ফেলে। টলমল নিজেকে সামলাতে পারে না যেন। টেনে টেনে শ্বাস নেয়, বুকের দম বন্ধ হয়ে আসছে। প্রায় আধ কলসী তাড়ী আর গণ্ডা কয়েক ফুলুরী খেয়ে বুক পেট যেন তার আইঢাই করছে।

লক্ষ্মণ সামন্ত হনহনিয়ে এসে টলটলায়মান জোসেফের কোমর জড়িয়ে ধরলো! বললে,—একটা গোপন কথা আছে। চ'ল একটুকু ফাঁকায় যাই।

নিজের শরীর-ভার লক্ষ্মণের স্কন্ধে ঝুলিয়ে বেঠিক পদক্ষেপে ধেনো-জমিতে পা দায় জোসেফ। বলে,—সামন্তর পো, নেশা ধ'রে গেছে মাইরী। চোখে লাল লীল দেখছি যেনে।

—দু'দণ্ড ঘুরাফেরা করলেই নেশা কেটে যাবে। লক্ষ্মণ সামন্ত সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিমায় বললে। জোসেফের কানের কাছে মুখ উঁচিয়ে ফিসফাস বলে,—সাহসে কুলায় তো একটা পরামর্শ দিই।

—কি? বল্ কেনে।

—তুমি সহায় থাকলে আমি তুমার হয়কে নয় করতে পারি। নয়কে হয়।

—আমি আবার কমনে গেছি। আমি ঠিক আছি। তুই বল দেখি কি বলতে চাস্।

বলি বলি ক'রে বলতে পারে না যেন লক্ষ্মণ। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে নিজের মনে। কি হ'তে কি হয় কে বলতে পারে। আসল কথাটি বলতে যেন লক্ষ্মণের ভয় ভয় করে। কে যেন কণ্ঠ চেপে ধরে। বুকটা ঢিপ ঢিপ করে। দুই কর্ণমূল জ্বলতে থাকে।

ইলসে গুঁড়ির মত ঝিরঝির বৃষ্টির রেণু পড়ছে মাথায় কপালে।

বরফের কুচির মত হিমঠাণ্ডা। বেশ লাগছে জোসেফের। নেশার উত্তেজনা আর দাহিকা প্রশমিত হবে জল হাওয়ায়। সর্বশরীর জ্বলছে যেন। ফুলুরীর সঙ্গে একটা গোটা কাঁচা লঙ্কা চেয়ে নিয়ে কচকচিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে জোসেফ। নেশার মুখে।

বুকের ভেতরে যেন দাউ দাউ আগুনের জ্বালা ধ'রেছে।

সামন্তকে নীরব থাকতে দেখে বিরক্ত হয়ে ওঠে জোসেফ। অদম্য কৌতূহলে রাগ হয় তার। বক্তা চুপচাপ কেন? বক্তব্য ব'লেও বলতে চায় না কেন? লক্ষ্মণের কাঁধে একটা সজোর চাপড় মারল জোসেফ। বললে,—চুপ মারলি কেনে অমন? জলে ভিজতে ভিজতে কুথায় চললি তুই?

—ভেবে একবার দেখবনি জোসেফ ভাই। বড্ড ডর লাগছে আমার।

—আমি যখন আছি, তোর ভয়টা কি? কোন্ শালাকে ভয়?

—পুলিসকে। কোতরংকে।

ফুঃ! তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো জোসেফ। ভিজে থেনো জমিতে পা ঠুকলো অবজ্ঞাভরে। বললে,—আমি যীশুকে ছাড়া আর কারেও ভয় করি না।

কপালে বুকে হাত ঠেকায় জোসেফ। ক্রুশ-চিহ্ন আঁকে। আমেন জানায় ইউদী ধর্মনায়কের নামে।

ফাঁকা আর শূন্য প্রান্তর। তবুও ফিসফিস কথা বলে লক্ষ্মণ। বললে,—নদীর ধারে চালকলের সাহাবাবুদের চালের আড়তে একবার হানা দিয়ে দেখলে কেমন হয়? রাণীবৌয়ের বাচ্ছাগুলাকে তো বাঁচাতে হবে আমাগোর। অনাহারে মরবে তারা?

—কথাটা মন্দ বলিস নাই সামন্তর পো। আড়তে একবার যেতে পারিতো এক আধ-বস্তা—

কথা বলতে বলতে কথা থামালো জোসেফ। তার চোখের সমুখে ফুটে উঠলো সাহাবাবুদের চালের আড়ত। পাশাপাশি অনেকগুলো। ঢেউ-খেলানো টিনের চালা সারি সারি। লক্ষ লক্ষ টাকার মাল আছে সেডের তলায়, বস্তাবন্দী হয়ে আছে। দেশে অন্ন-অভাব, দেখলে কে বলবে। সাহাবাবুদের লরী আর ট্রাক আছে কয়েকটা। রাতের অন্ধকারে মাল ওঠা নামা করে। চাল চালান যায় দেশ দেশান্তরে। বিদেশ বিভুঁই থেকে অর্ডার আসে, সাপ্লাই চালিয়ে যেতে হয়।

—কথাটা তুই মন্দ বলিস নাই সামন্তর পো। খুশী খুশী সুরে বললে জোসেফ। চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়লো, একটা মনের মত প্রস্তাবে। বললে,—একটা বস্তা সরিয়ে দিতে পারলেই চলবে। বেশী চাই না। খেয়ে শেষ করুক রাণীর বাচ্ছা ক'টা। তারপর আবার দেখা যাবে।

লক্ষ্মণ সামন্ত এধার সেধার দেখে নিয়ে চুপিচুপি বলে,—তবে আর দেরী নয়। চল' এখুনি বেরিয়ে পড়ি। যেতে যেতেই আঁধার নামবে।

—ঢাল-তরবাল নাই, তুই লড়াই করবি? ব্যঙ্গের হাসি জোসেফের কথায়। বললে,—খালি হাতে যাবি নাকি?

—কি চাই তাই বল' না। ছোবাছুরি? দা কাটারী?

—একখান টিন কাটা কাঁচি চাইরে লক্ষ্মণ। মিলবে কমনে? কোথায় পাবি?

—কামারশাল থেকে মিলবে। আমি লিয়ে আসছি। তুমি হেথায় থাকো কেনে। আমি যাবো আর আসবো। কথার শেষে লক্ষ্মণ প্রায় ছুট দেয় উর্ধ্বশ্বাসে। ঘাটের ধারে যেখানে দোকানের সারি সেদিকে চললো ছুটতে ছুটতে। সোয়াগীর তেলেভাজার দোকানের

পাশেই কামারশাল। সদাক্ষণ হাতুড়ী পিটছে, হাঁপর চালিয়ে চলেছে কারিগর। আগুনের স্তূপে লোহার টুকরো রাঙা হয়ে ওঠে। চালানের গরুর গাড়ীর চাকা সারানো হয় কামারশালে। ফাটা আর ভাঙা নৌকার লোহার পাতের তালি মারতে হয়। অবরে সবরে তৈরী হয় হাতা খুন্তী বালতী। শ্বাস-ওঠা মরণাপন্ন মানুষের পেটের মত হাঁপর চলতে থাকে সাঁ সাঁ শব্দে।

—কাঁচিখান চাই যে একবার দেওকী সিং। লক্ষ্মণ কামারশালে ঢুকে কথা পাড়লো চুপিসাড়ে। বললে,—কাজ মিটলে ফিরতি দিয়ে যাবো।

—হাতছাড়া করতে পারি না। অনেক কাজ আছে। হাতুড়ী পিটতে পিটতে বলে দেওকী।—কারিগর কখনও যন্তর ছেড়ে দেয়?

—হাঁ গো হাঁ দেয়। সদিচ্ছাটা থাকলেই দেয়। তুমিও দিবে বৈকি।

—ছ'টা টাকা জমা রাখো তবে।

—বিশ্বেস যদি না হয় তাই সই। এই লাও ছ'টাকা। কথার শেষে কোমরের কষি থেকে সত্যিই টাকা বের করলো লক্ষ্মণ। টাকা হাতিয়ে দিয়ে বললে,—জমার টাকা ফেরৎ মিলবে তো?

—জরুর মিলবে।

টিনকাটা কাঁচিখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে লক্ষ্মণ সামন্ত। স্বর্গের চাবি হাতে পেয়েছে যেন, এমনই আনন্দের আতিশয্য। দেখতে দেখতে কেটে পড়লো লক্ষ্মণ।

নেশার ঘোরে খাড়া দাঁড়াতে পারে না জোসেফ। বসে পড়েছে খেনো জমিতে। লক্ষ্মণকে আবার দেখতে পেয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠে যেন। বলে,—কাঁচি মিলে নাই না কি?

—হাঁ মিলেছে। করকরে দু'টা টাকা জমা রাখতে হয়েছে। লক্ষ্মণ সামন্ত যাওয়া আসার কষ্টে হাঁফাতে হাঁফাতে কথা বলছে।

কি যেন ভাবতে থাকে জোসেফ। ঘাট থেকে সাহাবাবুদের চালের আড়তের দূরত্ব আর ব্যবধান মনে মনে যেন খতিয়ে নেয়। বল্লে,—পায়ে হেঁটে যেতে যেতে বাজী ভোর হয়ে যাবে লক্ষ্মণ। ভেবে দেখো কেনে।

—একখান পানসীতে যাই চল'।

—পানসী লয়। একটা সাম্পান লিয়ে লাও।

—বেশ কথা। তাই হবে।

আলো-আঁধারি নেমেছে। দিনের আলো নিভে এসেছে। আকাশের কোলে কালির রেখা ফুটেছে। ঘাটের দোকানে দোকানে হ্যারিকেন আর লণ্ঠন জ্বলেছে। পাখীর দল বাসায় ফিরছে। বাদুড় উড়ে চলেছে খাদ্য সন্ধানে।

হাল ধ'রেছে লক্ষ্মণ সামন্ত। যন্ত্রের মত হাত চলেছে তার। কালবিলম্ব সহ্য হয় না, ধৈর্য ধরতে পারছে না। মুখে কথা নেই একটা। সাম্পান ছুটে চলেছে যেন মোটর লঞ্চের গতিতে।

রায়মঙ্গলের ঘোলাটে জলের তীব্র গতি। সাম্পান সোজা যেতে পারে না, জলের প্রচণ্ড বেগ। সমুদ্রের ঢেউ যেন, আছড়ে পড়ছে। চঞ্চলা হরিণীর মত একটা একটা ছোট ছোট ঢেউ, ফেঁপে ফুলে উঠে তরতরিয়ে পালিয়ে যায়। সাম্পান দুলতে থাকে খড়-কুটোর মত।

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। খেয়াল নেই লক্ষ্মণের। সে যেন রাজ্য জয় করতে চলেছে। সোনার খনির সন্ধান মিলেছে। গুপ্তধনের রহস্য জানতে পেরেছে। তাই বর্ষাধারাকে উপেক্ষা

করে। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। রাধাও মেলে না হয়তো, বিনা কষ্টে।

আঁজলা ভ'রে ঢক ঢক জল খায় জোসেফ। কণ্ঠতালু শুকিয়ে আসছে যেন। রায়মঙ্গলের জল কি মিষ্টি! বুকখানা জুড়ালো যেন এতক্ষণে। আঃ! তৃষ্ণার নিবারণে, তৃপ্তির আস্বাদে জোসেফ তাজা হয়ে ওঠে আকণ্ঠ জলপানের পর। বললে,—রাণীবৌ মানুষটা ভাল। এত সাত-সতেরো জানে না, বোঝে না।

রাণীর নাম শুনে অনুপ্রেরণা পায় যেন লক্ষ্মণ। জোরে জোরে দ্রুত গতিতে হাত চালায়। হাল টানার ছপাছপ শব্দটা মাঝ-নদীতে কেমন বেয়াড়া শোনায় যেন। কুলুকুলু প্রবাহের ছন্দ কেটে দেয়।

—ঘূর্ণীগুলাকে সামলে চল্ লক্ষ্মণ। জলের পাক, পেত্যয় হয় না। জোসেফ বললে এধার সেধার দেখে দেখে। দেখা যায় না সুস্পষ্ট। নদীর তীরে, বন-জঙ্গলে আর ঝোপেঝাড়ে অন্ধকার নেমেছে। কালো কালির প্রলেপ লেগেছে যেন।

ঠাণ্ডা হাওয়া আর বরফের কুচির মত ঝির ঝির বৃষ্টিতে ঘুম ঘুম পায় জোসেফের। ঊর্ধ্বদেহ এলিয়ে দিয়ে বসেছে সে। সাম্পান দুলে দুলে উঠছে জলের আবর্তে। নেশা আর তন্দ্রার ঘোরে নৌ-দোলা বেশ লাগছে যেন। শরীরে যেন একটা রোমাঞ্চের শিহর খেলছে!

রায়মঙ্গলের অন্য তীর থেকে একটা আলোকবিন্দু ভেসে আসছে। একটা যান্ত্রিক আওয়াজও যেন ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে।

জোসেফ মাথাটা খানিক তুলে শব্দের সন্ধান খোঁজে। ইদিক সিদিক দেখে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে।

—লঞ্চ গো লঞ্চ। পাটকলের বড় সায়েবের মোটর-লঞ্চ। সায়েব কল থেকে ফিরতিছে।

ব্যথিয়ে ওঠা হাত দু'টোকে খানিক জিরেন দিতে হালচালনা থামিয়ে বললে লক্ষ্মণ সামন্ত। সাম্পান আপন গতিতে ভেসে চলেছে। বুকভরা শ্বাস নেয় লক্ষ্মণ। দুই হাতের দশটা আঙুল পটাপট মটকে নিয়ে আবার হাল ধরে।

—ক্যানিলের মুখে লামতে হবে সামন্তর পো। জোসেফ বললে। —আবার এলিয়ে পড়লো। বললে,—ক্যানিলের জলা-জঙ্গলে সাম্পান বেঁধে পায়ে হাঁটতে হবে তোমাগোর পোয়াটাক কাঁচা রাস্তা!

লক্ষ্মণ ভয়ে যেন শিউরে উঠলো। বললে,—ক্যানিলের ধারে, জঙ্গলে পাল পাল হায়না আছে যে!

—দু'চারটা বাঘও আছে। তোমাগোর রয়াল বেঙ্গল। মানুষখেকো। মৃদু মৃদু হাসির সঙ্গে বলে জোসেফ। বাঘ আর হায়নার সঙ্গে যেন মিতালী আছে, এমনই সহজ কথার সুর।

—ক্যানিলের মুখে লেমে আর কাজ নাই। লক্ষ্মণ ভয়ে ভয়ে বললে। বলে,—শেষে কি বাঘের পেটে যেতে হবে!

হো হো শব্দে হেসে ওঠে জোসেফ। নদীর বুকে হাসির জোরালো ধ্বনি অনেক দূর ছুটে যায়।

—ক্যানিলের জঙ্গল থেকে দু'টা বাঁশ ভেঙে লোবোখ'ন। ভয় কি তোর?

—সেবার ঐ জঙ্গলে হায়নায় ধরেছিল আমাকে। শূয়োর মারতে গিয়ে ফ্যাসাদ বাধলো। পায়ে কামড়ের দাগটা এখনও আছে, এই দেখো কেনে। বর্শা-বল্লম হাতে ছিল তাই রক্ষে পাই। বল্লমটা তাক ক'রে ছুঁড়তে হায়নার সেরেফ পেটে গিয়ে বিঁধলো।

ঐ তো ক্যানেলের উঁচু চড়াই দেখা যায় ছায়া ছায়া। ময়াল সাপের মত ক্যানেলটা আঁকাবাঁকা প'ড়ে আছে। দুই পাশে কাশের ঝোপ। বাহার নেই তেমন, শ্বেত ময়ূরের পালকের মত। জলে ভিজে ভিজে কাশফুল চুপসে গেছে। ভিজে সাদা তুলো ছড়িয়ে আছে যেন রাশি রাশি।

ক্যানেলের মুখোমুখি সাম্পানখানা পৌঁছতেই দড়ি ধ'রে একটা লাফ মারলো জোসেফ। জল থেকে একেবারে ডাঙায় উঠলো। বললে,—লক্ষ্মণ, চটপট কাজ সারতে হবে। আর দেরী নয়।

দড়ির খুঁটি মাটিতে বিঁধিয়ে দিয়ে জোসেফ বাঁশঝাড়ের দিকে এগোয়। সাম্পানখানা জলাঝোপের আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ্মণ সামন্ত ছুটতে থাকে জোসেফের পিছনে।

বাঁশের ঝাড় মড়মড়িয়ে ওঠে। পাকা বাঁশ দু'খানা হাতের জোরে মচকে ভাঙলো জোসেফ। আশপাশের গাছে গাছে ভীরু পাখী পাখা ঝাপটে ওঠে। কটা বন বিড়াল ছুটে পালায়।

দু'জনের হাতে দু'খানা বাঁশ। লক্ষ্মণ আর জোসেফ চোরের মত বিদ্যুতের বেগে ছুটতে থাকে। পোয়াটাক যেতে হবে এখনও পায়ে হেঁটে। খানিক দূর এগোতেই জঙ্গলের ভেতর থেকে হায়নার ডাক শোনা যায়। দলে দলে মানুষ হাসছে যেন অট্টহাসি।

সাহাবাবুদের চালের আড়তের টিনের উঁচু সেড দেখা যায় কিছু দূরে। আকাশপটে যেন ছবির মত আঁকা রয়েছে। ঢেউখেলানো টিনের বড় বড় ঘর পাশাপাশি। দুর্ভিক্ষের আক্রামী আর সর্বহারা নিরন্নদের ভয়ে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে আড়তের সীমানা। দু'জন পাঠান প্রহরী আছে, পাহারার কাজে। টিনের ফটকের পাশের ঘরে থাকে দু'জন গার্ড। বিগত মহাযুদ্ধে

ইংরাজপক্ষে লড়াই ক'রেছে তারা ভারতের সীমান্তে। ইম্ফল-মনিপুরে। অবসরের পর আবার চাকরী নিয়েছে প্রাইভেটে।

আড়তের পেছনে পাহারা নেই, এই যা রক্ষা। নদীর ধার, তাই আর চোখ নেই মালিকের! প্রাকৃতিক জঙ্গলের বাধা অতিক্রম ক'রে কেউ আসবে না।

কট কট কাঁচি চালিয়ে চলেছে জোসেফ। টিনকাটা কাঁচি চালিয়েছে জলে ভেজা মরচে ধরা টিনে। কোনদিকে দেখছে না আর। একটা গোটা মানুষ আনাগোনা করতে পারবে, একটা চালের বস্তা বেরিয়ে আসবে সেই মাপে কাটতে হবে টিন। ধেড়ে ইঁদুর আর ছুঁচোর গর্ত এখানে সেখানে। সাপের খোলস। জোসেফের পা দু'খানা ছিঁড়ে কুটে যায়। লিকলিকে জোঁকের ঝাঁক।

লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে চোখ রাখে চতুর্দিকে। লক্ষ্য করে ভয়ে ভয়ে। পাহারার প্রহরীদের ভয় শুধু নয়, হিংস্র পশুর ভয় আছে যথেষ্ট।

কাটা টিনের কোনা ধ'রে হাঁ করিয়ে দেয় জোসেফ। তারপর নিজে সিঁদিয়ে যায় বিড়ালের মত। ট্যাঁকের পাক খুলে বিড়ি আর দিয়াশলাই বের ক'রে বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে জ্বলাকাঠির বাকী আগুন আর আলোয় দেখে নেয় শেডের ভেতরটুকু। হাজার হাজার বস্তা চাল। শেডের মাথা পর্যন্ত উঠেছে, ধাপে ধাপে।

চালের সুগন্ধ ভ্যাপসা হয়ে উঠেছে। জোসেফের হঠাৎ আবির্ভাবে ইঁদুরের পাল ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। অদম্য এক আক্রোশে জোসেফের ইচ্ছা হয়, চালের বস্তাগুলোয় আগুন ধরিয়ে দেয়।

বুক ঢিপ ঢিপ করে লক্ষ্মণের। ভয়ে কাঠ হয়ে আছে সে।

একটা গোখরো সাপকে মেরেছে লক্ষ্মণ। হিস হিস শুনেই এলো-পাথারী বাঁশ চালিয়েছে। সাপটা দ্বিখন্ড প'ড়ে আছে।

একটা গোটা বস্তা দেড় মণের। ভেতর থেকে বাইরে পড়লো ধপাস। লক্ষ্মণ চমকে উঠলো যেন। বস্তাটাকে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে রাখলো। জোসেফের প্রতীক্ষায় আছে শুধু।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাসে ঝড়ের আভাষ। আবার হয়তো ঝেঁপে বৃষ্টি নামবে। ক্ষেপা বাতাস বইতে থাকবে। আকাশ চমকে চমকে ওঠে। বিজলীর আভা ঠিকরোয় চাপা চাপা।

চকিতের মধ্যে কাজ সারতে হয়। জোসেফ আর লক্ষ্মণ বস্তা হিঁচড়ে হিঁচড়ে ছুটতে থাকে।

সাম্পানটা হঠাৎ দুলে ওঠে বস্তা পড়ার ভারে।

ঝিঁঝি ডাকছে মিশকালো আঁধারে।

মাঝরাতে রাণীবৌ শুনতে পায়, দুয়োরের কড়া নড়ছে খুটখুট। চৌধুরী ছিল ঘরে। রাণীকে ছেড়ে দিয়ে সে রুদ্ধশ্বাসে ব'সে থাকে নিশ্চুপ। এত রাতে কে আবার! কোতরং থেকে জমাদার দারোগা যদি আসে! চৌধুরীর কানে যায়, চেনা চেনা কণ্ঠস্বর।

—কে? লক্ষ্মণ সামন্ত? জোসেফ না কি?

—হাঁ গো। এক বস্তা চাল আনছি অনেক কষ্টে।

জোসেফ হেসে হেসে কথা বলে অন্ধকার থেকে। কাহিল শরীর তার ব'সে পড়ে দাওয়ার ভাঙা খাটিয়ায়।

—কাঁচিখান দাও জোসেফ। কাল আবার ফেরৎ দিতে লাগবে। দু'টা টাকা এই বাবদে জমা রেখেছে। কামারশালে। লক্ষ্মণ সামন্ত কথার শেষে হাত পাতলো।

কোমর থেকে এক টানে বের ক'রলো জোসেফ। খাপ থেকে যেন ভোজালী বের করলো। বললে,—এক পাত্র খাওয়াবি না চৌধুরী? শরীরলটা আমার টন টন করছে। পায়ে জোঁকের কামড় লেগেছে, জ্বলছে পা হু'খান। কাটা টিনের ঘা লেগেছে, এই দেখো কেনে।

জালায় কলসীটা ডুবিয়ে দেয় চৌধুরী। চোলাইয়ের জালায় থিতিয়ে আছে হয়তো ছিটেফোঁটা মাল। যা হাতে ওঠে তাই ভাল। কলসীটা এগিয়ে ধরে চৌধুরী।

শব্দহীন হাসি জোসেফের মুখে। বললে,—আয় সামন্তর পো। গলাটা ভিজিয়ে লে।

যার জন্যে চুরি সে এখন রসুই ঘরে। এক বস্তা চাল। রাণীবৌ খুশী আর আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলেছে। এক আধ দিস্তা রুটি তৈরী আছে। আধ বাটি বাটি-চচ্চড়ি আছে। ঝোলা গুড় আছে কলসীতে।

জোসেফ আর লক্ষ্মণকে খেতে দিতে হবে। হু'খানা সানকিতে খাবার সাজায় রাণীবৌ। হাসি আর অশ্রু তার মুখে চোখে। দুঃখের হাসি আর সুখের কান্না। প্রলয় আর শোকের মাঝে যেন আশার আলো দেখতে পায় রাণীবৌ। ভাতের অভাবে বাচ্চা ক'টাকে মরতে দেবে না রাণী! কত বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীর পুজা ক'রেছে সে। মা লক্ষ্মী আজ এতদিন পরে যেন চোখ তুলে তাকিয়েছেন। দয়া করেছেন। কৃপা ক'রেছেন।

মিষ্টি আর ক্ষীণ হাসির আভাষ রাণীর মুখে। চোখের কোণে জল চিকচিক করে। হঠাৎ হঠাৎ কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠছে থেকে থেকে। বমির উদ্রেক আসছে মাঝে মাঝে আজ সকাল থেকে।

রাণীবৌ বুঝতে পারে, তার পূর্বের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারে, সময় উৎরে গেছে যখন, তখন বাচ্ছাগুলোর আর একটা সঙ্গী আসছে। তাদের একটা সহোদর আসছে রাণীর পেটে।

দোষটা কার, শুধু ধরতে পারে না এই যা। জোসেফ? লক্ষ্মণ সামন্ত? না চৌধুরী?

বাইরে তখনও ঝিরঝির বর্ষণ চলেছে। ঝিঁঝি ডাকছে অবিরাম। গাছের আর ঘাসের সবুজ কচিপাতা আর কলি, পোকায় কাটছে কুটকুট।

রাণীবৌয়ের মুখে চাপা হাসি ফোটে আর মিলিয়ে যায়। একটা সন্দেহ আর ঔৎসুক্য জাগে তার মনে বার বার।

কার যে দোষ ধরতে পারে না রাণীবৌ। জোসেফ? চৌধুরী? লক্ষ্মণ সামন্ত? কে জানে কে! রাণীর মুখে হাসির আভা উঁকি দেয় আর মিলিয়ে যায়। এক এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে যেন থমথমে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

আঁধারে আলো ফোটে যেন। এক বস্তা চাল হাতের আওতায় এখন। জীবনের খোরাক। সঞ্জীবনী সুধা। বাঙালীর বেঁচে থাকার, মুখের গ্রাসের এক সুস্বাদ সুখাদ্য—চালভাত। অনন্য অন্ন!

বীজ থেকে ফল। কুঁড়ি ফুল হ'য়ে যেন ফুটে ওঠে রাণীর মুখে। মিষ্টি মিষ্টি হাসিতে।

বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। সবুজ কলি আর কচিপাতা, পোকায় কাটছে কুটকুট। বিজলীর ঝিলিক আকাশ কিনারে। হলুদ-লাল আলো।

---

# পিত্যেশ মিছা

তখন সবে মাত্র ভোরের আলো ফুটেছে। সিঁদুর-লাল মেঘ উদয়-দিগন্তে। ঠাণ্ডা বাতাসে কনক চাঁপার সুরভি। রাস্তায় জল বর্ষণের কাজ চলেছে তখন, হোস্ পাইপের পট-পট শব্দ শোনা যায় অস্পষ্ট। বস্তীর চালায় মোরগ ডাকাডাকি করছে, গেরস্থকে জাগিয়ে। দিকচক্রে ছাড়া ছাড়া চিমনীগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে এঁকে-বেঁকে—কল-কারখানার নাভিশ্বাস উঠছে যেন। ময়লা-ফেলা লরী ছোটাছুটি করছে পথে পথে—এক থেকে অন্য ডাষ্টবিনে গিয়ে থেমে পড়ছে। লরীর চাকা আর ইঞ্জিনের ঘর্ঘর ধ্বনিতে একেকটা পল্লী কেঁপে কেঁপে উঠছে। দুধওয়ালা আর খবর-কাগজের পিওনদের তীব্রগতি সাইকেলের সাবধানী ঘণ্টার ক্রীং-ক্রীং আওয়াজে রাস্তার কুকুরের পাল বিব্রত হয়ে আছে যেন।

কান পাতলেন একবার মাধবীলতা, বালিশে মাথা রেখেই। চোখে তন্দ্রাজড়তা। সারা দেহে আলস্যের অবসাদ! গুমোট গরমে সুখ-নিদ্রায় হয়তো ব্যাঘাত হয়েছে ঃ বিজলী পাখার হাওয়া অসহ্য ঠেকছে। সজাগ কানে মাধবীলতা শুনলেন, ছেলে তাঁর পড়ছে কি পড়ার টেবিলে। সূর্য উঠতে না উঠতে দিলীপ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে প্রত্যহ। মুখে চোখে জল দিয়ে পড়া মুখস্থ

করছে বসে একাগ্র মনে। পাশের ঘর থেকে শোনা যায় ছেলে পড়ছে, মাধবীলতা তখন নিশ্চিন্তায় আর এক ঘুম দেওয়ার চেষ্টায় থাকেন। আজ দিলীপের কণ্ঠস্বর কিছুতেই যেন কানে আসে না। ছেলে কি অবে ঘুমিয়ে আছে এখনও! ছেলের ঘুম ভাঙ্গাতে নিজেই তিনি উঠে পড়লেন শয্যা ছেড়ে। খুব সাবধানে, অতি সন্তর্পণে। পাশেই দিলীপের বাবা নিদ্রামগ্ন, নাক ডাকছে ঘন-ঘন! হাই-কোর্টের নামজাদা অ্যাডভোকেট দীপক মজুমদার—এখন কেমন শান্ত সুবোধের মত ঘুমিয়ে আছেন অকাতরে। মামলা, মকদ্দমা আর মক্কেল—এই ত্রি-মকারের সাধনায় মিঃ মজুমদার আত্মমগ্ন। গভীর রাত পর্যন্ত পড়া-শুনা করেন, নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেন। মক্কেলের সত্যপাঠ রচনা করেন—অ্যাফিডেফিট্ লিখতে হয় পার্টির পক্ষ থেকে। হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে মিঃ মজুমদার যেন অলৌকিক। তাঁর পসার অন্যের পক্ষে হৃদয়বিদারক। কয়েক হাজার মক্কেলের একমাত্র আশ্রয় তিনি। মামলার নথিপত্র দেখতে দেখতে আর জবাব লিখতে লিখতে একের পর এক সিগারেটের সঙ্গে এক এক চুমুক স্কচ্ হুইস্কি বিনা মিঃ মজুমদার এক কলমও লিখতে পারেন না। অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে যেন। মধ্য রাতের মৃদু-মন্দ নেশাটা যেন ঠিক এই ভোরের দিকেই জমাট বাঁধে। মিঃ মজুমদার একটু বেলায় ওঠেন তাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে স্নানাহার সেরে হাইকোর্টে চ'লে যান তাঁর ষ্ট্রীমলাইনড গাড়ীতে। গত সালে হাল ফ্যাশনের গাড়ী কিনেছেন আয়কর ফাঁকিয়ে। বিশাল বপু মোটর—ষ্টুডিবেকার, প্রেসিডেন্ট মডেল।

দুয়োর ঠেলতেই খুলে যায়। মাধবীলতা দেখলেন, ছেলে উঠেছে বিছানা থেকে, কিন্তু পড়ছে না। খোলা বই একপাশে পড়ে আছে অনাদরে। দিলীপ টেবিলে মাথা রেখে ব'সে আছে, না ঘুমিয়ে

আছে যেন বোঝা যায় না। তার মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল, পাখীর বাসায় মত দেখায় যেন।

—দিলীপ। দিনের প্রথম আহ্বান-কথা। মাধবীলতার কথার সুরে মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ কোমলতা। এক ডাকে সাড়া মেলে না। আবার ডাকলেন,—দিলীপ।

মাথা তুললো ছেলে। নীল সার্টের আস্তিনে ঘুম-ঘুম চোখ মুছলো। কপাল থেকে সরিয়ে দিলো অবিন্যস্ত চুল। মা লক্ষ্য করলেন, ছেলের চোখ দু'টি লাল। মুখখানি যেন থম থম করছে। বললেন,—'পড়া যে বন্ধ আজ, কেন? রাতে ঘুম হয়নি!'

লজ্জা আর অপ্রস্তুততার ক্ষীণ হাসি দিলীপের রাঙা মুখে। বললে,—ঘুমিয়ে পড়েছি কখন, মনে নেই। কথার শেষে খানিক থেমে থেকে আবার বললে, কেমন মিহি কণ্ঠে,—জানালা দুটো বন্ধ ক'রে দিয়ে যাও না মা। শীত শীত করছে যেন! আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে যাও।

দিনে আলো জ্বলবে! মাধবীলতা ছেলের কথায় কান দেন না, ছেলের কপালে হাত রাখলেন ধীরে-ধীরে। মাতৃকরস্পর্শ কপালে, নরম ঠাণ্ডা হাত মাধবীলতার। তিনি কেমন আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন যেন। বললেন,—তোমার কি জ্বর হয়েছে? কপাল আমার যে গরম ঠেকছে।

—না-না কিছু হয়নি। বেশ ভাল আছি আমি। কথা বলতে বলতে খোলা-বই সামনে টেনে নেয় দিলীপ, অবশ হাতে। বলে,—মাথায় শুধু একটু বেদনা, আর কিছু নয়।

—পড়তে হবে না তোমাকে, শুয়ে থাকো বিছানায়। কপালে হাত রেখে বললেন মাধবীলতা। দুশ্চিন্তার রেখা ফুটেছে তাঁর চোখে-মুখে। ব্যথাহত কথার সুর।

—কিছু হয়নি, তবুও শুয়ে থাকতে হবে! বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করে দিলীপ। কেমন যেন খিট-খিটে মেজাজে কথা বলে!

—না দিলীপ, তোমার বেশ জ্বর হয়েছে। আমি ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাই। কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মাধবীলতা। অন্যদিন সকালে কত প্রসন্ন থাকেন, আজ যেন তিনি কেমন ব্যস্ত আর চিন্তিত হয়ে থাকলেন। কথায় কথায় অনাবিল হাসি আজ আর নেই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো দিলীপ। দক্ষিণের জানালা দুটো বন্ধ করে দেয় একে-একে। চাকর কখন খবরের কাগজ দিয়ে গেছে পড়ার টেবিলে, খেয়াল হয়নি। একবার শুধু মাত্র প্রথম পাতাব শীর্ষে চোখটা বুলিয়েছে। সংবাদের শিরোনামা চোখে পড়েছে, বড় বড় কালো অক্ষরে ছাপা: No alliance with the west—যার বাংলানুবাদ 'পশ্চিমের সঙ্গে কোন আঁতাত নয়।' গণ-চীনের প্রতিভূ মাও-সে-তুং এই উক্তি করেছেন। ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে বিছানায় আশ্রয় নেয় দিলীপ। মাথাটা দপ্-দপ্ করছে কেমন। গায়ে যেন বেদনাবোধ।

মায়ের মন। স্নান-ঘর থেকে বেরিয়ে পবিচ্ছন্ন পোষাকে আজ আর পূজা-ঘরে গেলেন না মাধবীলতা। ক'বার মনে মনে ইষ্টমন্ত্র আউড়ে নিলেন। কপালে দুই হাত ছুঁইয়ে প্রণাম জানালেন আকাশ-প্রান্তে নতুন সূর্যকে। ছেলের ঘবে গেলেন অন্য কাজ ফেলে। আস্তে-আস্তে দুয়োর খুলতে দেখলেন, দিলীপ শুয়ে আছে খাটের বিছানায়। আবক্ষ ঢেকে দিয়েছে চাদরে। মাধবীলতা এক লহমায় দেখলেন, ছেলের মুখ যেন সাদা, রক্তহীন। চোখের চাউনিতে যেন জোর নেই। দিলীপ তাকিয়ে আছে খাটের কারু-কাজে। অপলক একদৃষ্টে দেখছে, কিন্তু দেখছে না

কিছুই। জ্বরের উত্তাপে হয়তো স্বভাব-শক্তি হারিয়ে ফেলছে প্রতি ক্ষণে।

—ডাক্তারকে টেলিফোন করেছি। কথার শেষে ছেলের শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালেন মাধবীলতা। দিলীপের কপালে ঠাণ্ডা হাত রাখলেন। সদ্যঃস্নাতা তিনি, সুগন্ধ তেল আর সাবানের মেশানো এক মৃদু গন্ধের আভাষ আসে তার সঙ্গে সঙ্গে। বললেন,—লক্ষ্মী ছেলের মত চুপটি করে শুয়ে থাকো। লেখা-পড়া থাক।

দিলীপের বিছানার আশেপাশে পাঠ্য বই—ফিজিক্স আর কেমিষ্ট্রির নানা রকমের বই। অঙ্কের আর গ্রাফের খাতায় হবেক-রকমের নক্সা। কলেজের নোট।

দরজা খোলার শব্দ হ'তেই ফিরে তাকালেন মাধবীলতা। দেখলেন সেই ফুটফুটে মেয়েটা এসেছে সাতসকালে। পাশের বাড়ির মেয়ে। কুমারী কিশোরী।

—মাসীমা, কি হয়েছে দিলীপের? ঘরের অসুস্থ আবহাওয়া দেখে শুধালো তনিমা। মা আর ছেলেকে দেখলো ব্যগ্রচোখে। বললে,—অসুস্থ না কি?

—হ্যাঁ মা, মনে হচ্ছে জ্বর হয়েছে। ডাক্তারকে তো ডেকেছি। মাধবীলতা কেমন যেন মনমরা সুরে বললেন। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন,—তনিমা, তুমি এসেছো ভালই হয়েছে। দিলীপকে গল্পের বই প'ড়ে শোনাও, যদি ওর ভাল লাগে। আমি যাই তোমার কাকাবাবুর খাওয়ার ব্যবস্থাটা সেরে আসি। কোর্টের টাইম তাঁর আবার।

বইয়ের দেরাজের কাছে এগিয়ে যায় তনিমা। সারি সারি বই এক এক তাকে। দেশী আর বিদেশী লেখকের লেখা। আড়াআড়ি

দৃষ্টিতে বইয়ের নাম পড়তে থাকে তনিমা। দেখতে দেখতে বলে,—'কি বই পড়বো, তুমিই বল'।

যে শুনবে তার যেন শোনার ইচ্ছা নেই। সামান্য কৌতূহলের সঙ্গে দিলীপ চোখ ফিরিয়ে দেখলে তনিমাকে। আজ কেমন দেখতে হয়েছে তনিমাকে। কোন্ রঙের শাড়ী পরেছে। দেখলো, তনিমার আলুথালু চুল, আল্‌গা খোঁপা পিঠে ঝুলছে। ঘুমভাঙা চোখ যেন তনিমার।

তনিমা বললে,—নেপোলিয়নের জীবনী শুনবে? শেক্সপীয়রের নাটক? চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস?

—উঁহু। এপাশে ওপাশে মাথা দোলায় দিলীপ। অসম্মতি জানায়। অবশ হাতে, এক মনে চাদরের এক কোণ পাকাতে থাকে। চোখের দৃষ্টি যেন শক্তিহীন।

—রবীন্দ্রনাথের কবিতা? শরৎচন্দ্রের কোন গল্প?

—না।

—তবে কি বই শুনবে? জেমস জীন, এইচ জি ওয়েলস্, এডিসনের জীবনী?

—হ্যাঁ। তোমার যদি ইচ্ছা হয় প'ড়ে শোনাও।

তনিমা এক ঝলক খুশীর হাসি হাসলো। একটা বাঁধাধরা সুরে আর গতিতে পড়তে শুরু করলো বৈজ্ঞানিক এডিসনের জন্ম-বৃত্তান্ত। পাতা দুই পড়ার পর বই থেকে চোখ তুলে তনিমা দেখলো, শ্রোতা অন্যমনা। কেমন যেন অনাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অন্যদিকে। দিলীপের চোখের তলায় কালি। পাংশু বর্ণ।

—ভাল লাগছে না শুনতে? তনিমা জিজ্ঞাসা করলো। বললে,—বই রেখে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো?

হ্যাঁ কিম্বা না কিছুই বলে না দিলীপ। আচ্ছন্নের মত মুক্ত

চোখ বন্ধ করলো। মাথার বেদনা কি কষ্টকর আর অসহ্য! অন্ত দিনে তনিমাকে দেখলে আনন্দে কথা হারিয়ে ফেলে। আজ আর চোখ নেই তনিমার দিকে। সে যেন অপরিচিতা।

তনিমার বুক দুরদুর করে এলোমেলো ভাবনায়। ভয় ভয় করে কি এক আশঙ্কায়। নিশ্চুপ ব'সে থাকে সে রোগীর মুখে চোখ রেখে।

—ডাক্তারবাবু এসেছেন।

দুয়োর ঠেলে ঘরে ঢুকলেন মাধবীলতা। তাঁর পেছনে ডাক্তার আর মিঃ মজুমদার। দিনের প্রথম চুরুট ধরিয়েছেন অ্যাডভোকেট সাহেব। তাঁর স্লিপিং গাউনের রেশমী কোমরবন্ধ শিথিল হয়ে আছে। ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি। হাভানা চুরুটের গন্ধ আসছে সা... ।ড়িতে

জ্বর পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। রোগীর মুখের ভেতরে খানিক মিটার রেখে কাচকাঠি আলোয় তুলে ধরলেন।

মাধবীলতা বললেন ব্যগ্র-আকুল সুরে,—কত দেখলেন? জ্বর আছে?

ওপরে নীচে মাথা দোলালেন ডাক্তার। বললেন,—হ্যাঁ, জ্বর আছে। প্রায় একশো দুইয়ের কাছাকাছি। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমি তিন রকম ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। এক এক ঘণ্টা অন্তর এক একটা খাবে। লিখে দিচ্ছি কখন কোন্‌টা খেতে হবে।

কথা বলতে বলতে ডাক্তার চামড়ার হাত-ব্যাগ খুললেন। তিন রকমের শিশি থেকে প্রায় এক ডজন ক্যাপ্‌সুল্‌ বের ক'রে দিলেন। তিন রঙের ওষুধ, তিনটি ছোট খামে ভ'রে দিলেন। তারপর নিজের নাম আর রেজিঃ-নম্বর ছাপা প্যাডে নির্দেশ লিখতে থাকলেন অপাঠ্য হস্তাক্ষরে। লিখতে লিখতে বললেন,—ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে।

কিছু ভয়ের নেই। জ্বর একশো চার ডিগ্রী উঠলেও ভয় নেই। তবে এ ছোঁয়াচে, তাই সাবধান হ'তে হবে।

তিন রকমের তিন রঙা ক্যাপস্যুল্। একটিতে জ্বরের মাত্রা কমবে, একটি পেটের জন্য জোলাপ, একটি অম্লনাশক।

ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে মিঃ মজুমদার আর মাধবীলতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যদি কোন' গোপন কথা থাকে ডাক্তারের, মাধবীলতা ব্যাকুল হয়ে থাকেন। যদি একটা খারাপ কিছু বলেন। কোন অমঙ্গলের আভাষ শুনিয়ে যান যদি।

—আজ আর খেতে দেবেন না ওকে, ডাক্তার করিডরে বেরিয়ে বললেন। মিঃ মজুমদার দর্শনীর দক্ষিণাটা ডাক্তারের এক পকেটে রেখে দিলেন। যেন তাঁর নিজেরই পকেট।

প্রথম ওষুধ খাইয়ে দেয় তনিমা। জল আর ওষুধ। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বিছানার পাশে বসে। অনেক চেষ্টাতেও মুখের ভয়ার্ত ভাব যেন কাটিয়ে উঠতে পারে না। তবুও হাসতে চেষ্টা করে! তার হাসি-উচ্ছলতায় যদি সাড়া দেয় দিলীপ। একটু যদি হাসে অন্য দিনের মত।

—তুমি এখন যাও। কথা বললে দিলীপ, ক্ষীণ কণ্ঠে। মুখে যেন তার চরম অনাসক্তি।

—কেন? তনিমা শুধালো শঙ্কিত হয়ে। বললে,—আমি যাবো কেন? কোথায় যাবো?

—বাড়ি ফিরে যাও। এখানে আর থেকো না। শুনলে না, ডাক্তার বললেন, এ অসুখ ছোঁয়াচে। কথা বলতে যেন কষ্ট হয় দিলীপের। ঘরের কড়িকাঠে চোখ তুলে চেয়ে থাকে।

—তা হোক। আমি যাবো না এখন, মাসীমা যতক্ষণ না আসছেন। তুমি একটু ঘুমাও, লক্ষ্মীটি।

—ঘুম যে আসছে না। কেবল আজেবাজে ভাবনা আসছে মনে। দিলীপ বিরক্তির সঙ্গে বললে। চাদর টেনে ঢেকে ফেললো পা থেকে বুক।

—ভাবনা ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়'। তোমার অসুখ ভারী বিশ্রী লাগছে আমার কিছু আর ভাল লাগছে না। তনিমা মিহি মিষ্টি সুরে কথাগুলি বলতে বলতে দুয়োরে চোখ ফেরায় বার বার। পাছে কেউ শোনে তার মনের কথা।

—আর কত দেরী আছে? কেমন অনর্থক প্রশ্নটা, করুণ চোখে তাকিয়ে বলে দিলীপ। সে কি বলতে চায়, যেন বোঝা যায় না ঠিক।

—কিসের দেরী? কি বলছো তুমি? সভয়ে বলে তনিমা। কাঁপা কাঁপা সুরে।

—আমি হয়তো আর বাঁচবো না।

—ছি, এমন কথা বলতে নেই।

দিলীপ শুনেও শোনে না। কথার শেষে চোখ দু'টিকে বন্ধ ক'রলো অতি ধীরে ধীরে।

মাধবীলতা আবার ঘরে আসেন বিষণ্ণ মুখে। ডাক্তার অভয় দিয়ে গেলেন বৃথাই। মনে মনে দেবদেবীর দাম স্মরণ করেন। একমাত্র ছেলে তাঁর, বংশের উত্তরাধিকারী—ভয়ে যেন সারা হয়ে যান মাধবীলতা। ছলছল চোখ। বললেন,—কি বলছে দিলীপ?

তনিমা বললে শোনা কথা ক'টা। দিলীপের মুখের কথা। শ্রুতিকটু অমঙ্গলের কথা শুনে মাধবীলতা গালে হাত দিলেন।

—মৃত্যু এত সহজে আসে না। মিঃ মজুমদার কখন এসেছেন, কথা বললেন স্ত্রীর পাশ থেকে। বললেন,—মৃত্যুর পদক্ষেপ অতি

ধীরে ধীরে। অনেক অপেক্ষা, অনেক প্রতীক্ষার পর মরণ আসে চুপি চুপি। আমি তোমার বাবা, এখনও ম'লাম না যে।

—ওগো, থাক এ সব কথা। মাধবীলতা কথা বললেন কম্পিত-কণ্ঠে। বললেন,—দিলীপ এমন কত বাজে কথা বলে যখন তখন, যেতে দাও ওর কথা।

বাবার কথায় মন যেন সায় দেয় না ছেলের। বীতস্পৃহের মত ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে থাকে। খাটের পায়ার দিকে নিবদ্ধ চাউনি। দেহ-যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটেছে মুখে। কি যেন ভাবছে। দুর্ভাবনা।

—তোমরা এখান থেকে যাও। একা থাকতে দাও আমাকে। অসুখ যে ছোঁয়াচে। দিলীপ কথা বলে কারও দিকে না ফিরে। খাটের পায়া দেখছে তো দেখছেই এক নজরে।

তনিমার বুক দুরু দুরু করে। বিজলীর ক্ষীণ আঘাতের মত দুঃখের একটা বিশ্রী অনুভূতিতে কেঁপে কেঁপে ওঠে তার সর্বদেহ। দিলীপের একটা একটা কথায় যেন শক্ পায় সে।

—কেন এমন কথা ব'লছো দিলীপ? মা বললেন অনুযোগের সুরে। ছেলের মাথায় হাত রেখে বললেন,—এখন কোন কথা নয়, তোমাকে ঘুমোতে হবে।

—ঘুম যে আসছে না। আজে বাজে চিন্তা আসছে মাথায়।

—দুশ্চিন্তা দূর ক'রতে হ'লে মনকে সংযত করতে হয়। মিঃ মজুমদার মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে কথা বললেন, ভারী গলায়। খানিক থেমে থেকে আবার বলেন,—ওষুধ ক'টা ঠিক ঠিক খায় যেন। আমি যাচ্ছি, কোর্টের টাইম এগিয়ে আসছে। কথা বলতে বলতে ছেলের একখানি অবশ হাত নিজের হাতে ধরলেন। বিদেশী কর-মর্দনের ঢঙে হাত নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন,—দিলীপ জাষ্ট্‌ চিয়ার আপ্‌। ফাইট আউট ড্যাম ইনফ্লুয়েঞ্জা। ডোণ্ট্‌ ফরগেট্‌, মৃত্যু

বা মরণ কারও হাতধরা নয়। ইচ্ছামৃত্যু কথাটা পৌরাণিক, আই মীন্ মাইথলজিকাল্।

হাইকোর্টের ঘণ্টাধ্বনি, সময় সঙ্কেত কানে আসে যেন অ্যাডভোকেট সাহেবের, ঘরের ইদিক সিদিক ঘড়ি খুঁজতে খুঁজতে চুরুটের ধোঁয়া ভাসিয়ে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

—মাসীমা, আপনি যান। আমি আছি দিলীপের কাছে। কাকাবাবু কোর্টে যাবেন এখনই। তনিমা কথা বলতে বলতে বিছানার এক তীরে বসে পড়লো। বললে,—আর একবার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

মাধবীলতা নিরুপায়, অসহায়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দুয়োর পেবিয়ে বললেন,—ঘুমোতে চেষ্টা কর' দিলীপ। খানিক ঘুম হ'লেই জ্বর-জ্বালা ক'মে যাবে।

এক পেয়ালা জল আর ওষুধ এগিয়ে ধরে তনিমা, রোগীর মুখের কাছে। এক ঝলক হাসির সঙ্গে বললে,—খেয়ে নাও লক্ষ্মী ছেলের মত।

বেশী বলতে হয় না। দিলীপ ওষুধ আর জল খেয়ে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থাকে। চোখে যেন অপ্রসন্ন দৃষ্টি। ধীরে ধীরে কথা বললে,—ওষুধে কি ফল পাওয়া যাবে।

—নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তনিমা সজোর-কণ্ঠে বললে, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে।

খুশী হয় না যেন দিলীপ। মুখখানি বিকৃত করে দেহকষ্টে। খাটের পায়ার দিকে চোখ রেখে বললে,—আর কতক্ষণ দেরী আছে? কখন আমি মরবো?

—না না না। তনিমার চোখ ছলছল করে। বলে,—এ সব কথা কেন ভাবছো তুমি? ইনফ্লুয়েঞ্জায় মরে না কেউ।

—কাগজে দেখছি, গত সপ্তাহে প্রায় পঞ্চাশজন ফ্লুতে মারা গেছে। দিলীপ শক্তিহীন ক্ষীণ সুরে কথা বলছে। মৃত্যুর খতিয়ান শোনায়।

মৃত্যুর প্রতীক্ষায় মিনিট গুণতে থাকে দিলীপ। মরণ বরণের অধীর প্রতীক্ষা তার। মৃত্যুর প্রত্যাশায় দিন আর রাত্রি কেটে যায়। পরোয়ানা আসে না তবু।

পরের দিন সকালে ছেলের ঘরে আসেন মিঃ মজুমদার। উচ্ছ্বসিত হাসি তাঁর মুখে। গতকাল একটা বিরাট মামলার রায় দিয়েছেন জজ। তাঁর মক্কেলের জিৎ হয়েছে, সেই আনন্দে হাসি-খুশী তিনি।

ছেলে ম্লানমুখে শুয়ে আছে বিছানায়। মাধবীলতা মিটার দিয়ে দেখছেন, ছেলের জ্বর কমের দিকে।

মিঃ মজুমদার বললেন,—দিলীপ, তুমি তো আজ ভাল আছো।

নেতিবাচক মাথা দোলায় ছেলে। অস্বীকার করে যেন। বিরক্তি প্রকাশ করে। ছেলের আত্মজ্ঞানে হাসি পায় অ্যাডভোকেট সাহেবের। হো হো শব্দে হেসে উঠলেন তিনি।

মাধবীলতা বললেন,—মা দুর্গার কৃপায় জ্বরটা যা হোক তবু ক'মেছে। আমিতো ভেবেই সারা।

চুড়ির রিনিঝিনি ভাসলো ঘরে। স্নো-পাউডারের সৌগন্ধ বহন ক'রে আনলো কে যেন। তনিমা ঘরে আসে। সাগ্রহে বলে,—মাসীমা, কেমন আছে দিলীপ?

—আজ একটু ভাল আছে মা। জ্বর কমের দিকে। মাধবীলতার মুখে অনাবিল মৃদু মৃদু হাসি।

—আগে আমার পালা। আমি আগে যাবো, তারপর অনেক অনেক পরে তোমার যাওয়ার পালা আসবে। তার অনেক দেরী।

মিঃ মজুমদার মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে কথা বলছেন। বললেন,—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইলের পথ পেরিয়ে মৃত্যুকে আসতে হয়, তাইতো এত দেরী, এত বিলম্ব। 'দেয়ারফোর ডু নট ওয়ারি মাই বয়।'

মাধবীলতার আঁখিপ্রান্ত চিকচিকিয়ে উঠলো যেন! অ্যাডভোকেট সাহেবের বিজ্ঞ কথাগুলি যেন ভাল লাগে না। তাঁর ইচ্ছা, স্বামীর আগে তিনি যাবেন।

অন্যদিন তনিমাকে দেখলে আনন্দের আতিশয্যে লেখাপড়া স্থগিত রাখে দিলীপ। তনিমাকে দেখে অপলক চোখে। আজকে যেন তনিমাকে দেখেও দেখলো না। ফিরেও তাকালো না। একরাশ বিরক্তি আজ দিলীপের মনে। কৈ, মৃত্যু আসে না কেন?

# বিশাখা ষেওনা

অমাবস্যা কাটলো না।

অর্থবল, লোকবল, প্রতিপত্তি সবই মূল্যহীন হয়ে যায় একদা নিশীথ রাতে। শীতের ঠাণ্ডা জমাট-বাঁধা ঘন অন্ধকার জানলার বাইরে। বিশাখা যেন তাকাতে পারে না আর, ক্লান্ত চোখের পলক পড়ে না তবু। ঘরের কোণে স্বল্প আলোর হ্যারিকেন জ্বলছে। কেন কে জানে আলোর শিখা দপ দপ করছে হঠাৎ। বিশাখা চোখ ফিরিয়ে দেখলো টেব্‌লে সারি সারি ওষুধ ইনজেক্‌শনের শিশি আর অ্যামপুল্‌। প্লুকোশ ডি। সঞ্জীবনী সমারোহের এক পাশে সচল ঘড়িতে রেডিয়ামের অক্ষর আর কাঁটা নীলাভ আভা ছড়ায়। ঘড়িতে টিক টিক শব্দটা গভীর রাতের নীরবতায় স্পষ্ট শোনা যায়।

রাত্রি বারোটা তেত্রিশ মিনিট এখন। ঠিক এই দুঃসময়ে বিশাখার ঘরের কোণে জ্বলন্ত হ্যারিকেনের শিখা আর একবার দপদপিয়ে ওঠে। বিশাখা রোগীর শিয়রে ব'সে আছে পাষাণের মত, একটা বেতের মোড়ায়। হঠাৎ যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে অমলেশ। তার চোখের চাউনি কাকে খুঁজে চলেছে। বিছানার এধার সেধার দেখলো অমলেশ। বিশাখাকে দেখতে পেয়েই যেন শান্ত হয় রোগী। চাউনি থেমে থাকে। অমলেশের স্থিরদৃষ্টি। দেখতে দেখতে

কেমন যেন একটা অসহ কষ্টকাতরতা ফুটলো অমলেশের মুখে। শেষবারের শ্বাস পড়বে এই মুহূর্তে। কত কষ্ট বুকে!

একটা চাপা কান্নার রোল উঠলো বাড়িতে। ভরা অমাবস্যার ঘন-কালো অন্ধকার থমকে থাকে না আর। ঘরের বাইরে শীত শীত বাতাস চলেছে। মৃত্যুপথ যাত্রী অমলেশ যেন আশপাশের সকল বসতিকে ফিস ফিস ডাক দিয়ে তুলে দেয় ঘুম থেকে। অকাল বিয়োগের ব্যর্থ প্রতিবাদের ভঙ্গিমা ফুটে আছে অমলেশের পাংশুশুভ্র মুখে। দুঃখ বেদনার ক্ষীণ হাসি লেগে আছে যেন রক্তহীন ঠোঁটের প্রান্তে। বিশাখার হিমঠাণ্ডা মুঠোয় ধরা অমলেশের একখানি অসাড় হাত। বিশাখা মাথা লুটিয়ে দিয়েছে অমলেশের বুকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সভ্যশোকে।

অক্সিজেনের ভারী লোহার টিউবটা কারা যেন ঘর থেকে সরিয়ে দিয়ে যায়। দুর্মূল্য ওষুধ আর ইনজেকশন সাজানো টেব্‌লটা ধরাধরি ক'রে ঘরের বাইরে বের করা হয়। ঘরের বন্ধ জানালা খুলে দেওয়া হয়। হ্যারিকেনটা ম্লান হয়ে গেছে সভ্যজ্বালা বিজলী আলোয়।

বিশাখা আর অমলেশ ছাড়া এখন আর কেউ নেই ঘরে। একটা সুযোগ দেওয়া হয় যেন বিশাখাকে। শেষ দেখার, শেষ কাছে যাওয়ার শেষ সুযোগ।

অসুখের রিপোর্ট-খাতার পাতা উড়ছে। ঠাণ্ডা এলোমেলো হাওয়া চলেছে হঠাৎ। কত কতদিনের ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর মৃত্যু দূতের আশা মিটেছে এতক্ষণে। কালো পালখের পাখনা উড়িয়ে যেন নাচতে শুরু করেছে শূন্যে ভাসতে ভাসতে। রাত্রির মিশকালো অন্ধকার—সত্যিই মূর্তিমান অকল্যাণ যেন। শীত শীত বাতাসে অমঙ্গলের সুর।

পাশের ঘরে ডাক্তার সার্টিফিকেট লিখছেন মরণ পারের। হাতে খস্ খস্ লিখে চলেছেন রোগী আর রোগের নাম। বয়স আর বিবরণ।

অমলেশের দূর সম্পর্কের এক পিসীমা লীলাবতী টেলিফোনের রিসিভার তুলছেন আর রাখছেন। অমলের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবীদের দুঃসংবাদটা শুনিয়ে দেন লীলাবতী। বলছেন ক্ষীণ কণ্ঠে,—এসো সব তোমরা, আমার অমলকে দেখে যাও শেষবারের মত।

—এত লোক ডাকাডাকি, মানুষের ভীড়, আমি পছন্দ করি না।

অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর শুনে লীলাবতী যেন চমকে উঠলেন। রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তৎক্ষণাৎ। পিছু ফিরে তাকিয়ে বিশাখাকে দেখে কেমন যেন স্থির হয়ে গেলেন বিস্ময়ের ঘোরে। কথা বলতে চেষ্টা করলেন কি একটা। কিন্তু মুখ থেকে কথা স'রলো না।

বিশাখা আবার বললে,—দলে দলে লোক আসবে আমাকে সান্ত্বনা জানাতে, তার কোন' প্রয়োজন আছে কি ?

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লীলাবতী। বললেন,—এ কি কথা বৌমা, খবরটা জানতে পাবে না কেউ? শেষে যে আমাকে সকলে দুষবে।

আবার সেই রুক্ষ কণ্ঠস্বর। বিশাখা বললে,—তাদের কাছে আমার নাম বলবেন। জানিয়ে দেবেন আমি মানা ক'রেছি।

লীলাবতী নিশ্চুপ। তাঁর চোখের পলক পড়ছে না। কপালে বিরক্তির রেখা ফুটেছে।

কথার শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে বিশাখা। পিসীমা লক্ষ্য

করলেন, বৌয়ের মুখচ্ছবি কেমন কঠোর-কঠিন। তরোয়ালের মত সূক্ষ্ম ভুরু আরও যেন বেঁকে গেছে। টানা টানা চোখের তলায় বিনিদ্র রাতের কালিমা। শুধু চোখ দু'টি ঈষৎ সজল যেন। চোখের পাতা ভিজে।

একলা ঘরে খানিক কাঁদলেন লীলাবতী। নীরব অশ্রুধারায় আঁচল ভিজতে থাকলো। একখানি ইজি-চেয়ারে ব'সে পড়লেন তিনি। নিরাশায় ডুবে গেলেন যেন।

আঁধার কখন সামান্য ফিকা হয়েছে দূরদিগন্তে। বাগানে টেনিস-লনের লতায়-ঢাকা ফেন্সিংএ চড়াই পাখী কিচ কিচ ডাকছে।

দাবানলের মত অমলেশের শেষ যাত্রার খবর ছড়িয়ে প'ড়েছে এখানে সেখানে। নীচে গাড়ী-বারান্দার তলায় করিডরের সমুখে বিরাট বিরাট মোটর এসে দাঁড়ায়। শোকার্তদের নামিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে রাস্তায় বেরিয়ে পার্কিং করছে।

টালিগঞ্জের দিদির গাড়ী ঐ তো। একখানা ষ্টুডিবেকার সবুজ রঙের। পটলডাঙ্গার কাকাবাবু নামলেন গাড়ী থেকে। সেকেলে বিশালবপু রোলস্ ফিয়াট তাঁর। টালার নতুন মাসীমা আর তার ছেলেমেয়েরা এলেন তাদের দু'খানা গাড়ীতে দুই দলে। ক্যাডিলাক আর বুইক এইট। অমলেশের ক'জন বাল্যবন্ধু আসে। একখানি রেশিং জাগুয়ার এসে দাঁড়িয়ে পড়লো টেনিস-লনে। মালিক স্বয়ং চালক। হিমার্ত ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস অসহ ঠেকতে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল মল্লিকা চৌধুরী। আধ-খাওয়া সিগারেট লনের সবুজ ঘাসে ফেলে দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি ধ'রে ওপরে উঠলো মল্লিকা। একজন বান্ধবী অমলেশের। পিসীমা লীলাবতী জানতেন চিনতেন মল্লিকাকে। তাই তাকে ডাক না

দিয়ে পারলেন না। ভবানীপুরের সেজদাছু এসে পড়লেন শোকে অধীর হয়ে। অবিশ্বাস্য সংবাদের সমর্থন জানতে এলেন যেন। সেজদাছুর পুরানো মডেলের ডজ্‌ গাড়ীর বল্‌-হর্ন রাস্তার মোড়ে একবার বেজে উঠতেই সকলেই চিনতে পারে ভবানীপুরের গাড়ী।

কোথা থেকে অকল্যাণী বিদ্যুতের মত আবার উড়ে আসে বিশাখা। মাথা থেকে গুণ্ঠন খ'সে পড়েছে। রুক্ষ একরাশ কালো চুলের ঢেউ বিশাখার পিঠে ছড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে নেয় বিশাখা। ডায়াল ঘুরতে থাকে সশব্দে।

—হ্যালো, ফনোগ্রাম এক্স্‌চেঞ্জ্‌?

অন্যপক্ষের সম্মতি। ঘুমন্ত অপারেটর হঠাৎ ডাকে সাড়া দেয়।
—ইয়েস্‌, মাদাম।

বিশাখা বললে,—প্লীজ্‌ টেক্‌ নোট। মেসেজ্‌ টু—

টেলিফোন মারফৎ টেলিগ্রাম। বিশাখা জানিয়ে দেয় তার প্রবাসী বাবাকে। জানিয়ে দেয়, 'অমলেশ এক্স্‌পায়ার্ড'।

পিত্রালয় অনেক দূরে বিশাখার। জয়পুরে। রাজস্থানে। বিশাখার বাবা না কি জয়পুরের খ্যাতিমান সার্জন! শল্যচিকিৎসায় হাতযশ সুপ্রচুর। ফনোগ্রাফ তাঁর হাতে পৌঁছতে সকাল সাতটা বাজবে হয়তো। ভাবতে ভাবতে রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বিশাখা।

লীলাবতী পিসীমা ইজি-চেয়ারে অর্ধশায়িতা। তাঁর মুখখানি শুভ্র আঁচলে ঢাকা। তিনিই যেন শোক পেয়েছেন বেশী, ভেঙে পড়েছেন হতাশায়। চোখে যেন কেবলই অন্ধকার দেখছেন। কিছুতেই ঠাওরাতে পারছেন না, কোথা থেকে এই দুরারোগ্য অসুখটা এসে তিলে তিলে গ্রাস ক'রেছে অমলেশকে! প্রথমে ধরা

পড়ে প্লুরিসি। ডানদিকের বুকে কালো প্যাচ। এক্স-রে প্লেটের নেগেটিভে অমলেশের লুকানো অন্তরের ছবি। ধীরে ধীরে রোগ বিস্তারিত হতে থাকে। প্লুরিসি থেকে টিউবারকিউলিশিশ্। বুকটা একেবারে জখম হয়ে যায় অমলেশের। ঝাঁজরার মত।

এই পরিবারের পুরোহিত এসে পড়েছেন খবর পেয়ে। অমলেশের ঘরে শান্তি-স্বস্ত্যয়নে বসেছেন। দোষ খণ্ডনের মন্ত্র-গুঞ্জনে ভোরের বাতাস থমকে থাকে যেন। কুগ্রহ শান্তির অনুষ্ঠান চলেছে। ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে—

উদভ্রান্ত মল্লিকা চৌধুরী ধীর পদক্ষেপে এসে অমলেশের ঘরের দুয়োরে দাঁড়িয়েছে কখন। মল্লিকার ঠাণ্ডা আর নরম বক্ষদেশ শোকের আবেগে থর থর কাঁপছে। ছল ছল চোখ। শীতের রাতে নিজে মোটর হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মল্লিকা। গায়ে মেরুণ রঙের পশমের জালি-স্কার্ফ জড়িয়েছে।

দেরাজ-আলমারি খুলে বিশাখা কি সব যেন বের করছে আপন মনে। একখানা আনকোরা কোঁচানো ধুতি জরি পাড়ের, গরদের পাঞ্জাবী, সিল্কের গেঞ্জী। একটপ দামী এসেন্স। ইউক্যালিপটাশের সবুজ শিশি। একটি নতুন রুমাল।

—মল্লিকা!

ডাক শুনে চমকে ওঠে মল্লিকা চৌধুরী। একটা বুকপোড়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পিছু ফিরে তাকায়। চোখে মরা চাউনি যেন তার।

বিশাখাই কথা বলছে মৃদু কণ্ঠে। দললে,—তোমার বন্ধুকে সাজিয়ে দাও।

কথা বলতে বলতে সাজসজ্জার উপকরণ মল্লিকার হাতে তুলে দেয় বিশাখা।

—আমাকে ক্ষমা কর' ভাই। মিনতির সুর মল্লিকার কথায়। মুখ ভঙ্গিমায় সকাতর অক্ষমতা। চক্ষুপ্রান্তে জলের চাকচিক্য। বলে,—হাত পা কাঁপছে আমার। বড্ড নার্ভাস্ লাগছে নিজেকে।

ভাবতেও শিউরে উঠছে মল্লিকা। একটা নিঃসাড় দেহকে সাজাতে বসতে হবে। মনটা যেন কিছুতেই শক্ত হ'তে চায় না। হাত দু'টি অবশ ঠেকে নিজের। কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অমলেশের সঙ্গে, অন্তরের যোগাযোগ—সব কিছু উবে গেছে কর্পূরের মত। মল্লিকার কাছে অমলেশ আজ যেন অপরিচিত। বিয়োগ-বিচ্ছেদ এসে ভুলিয়ে দিতে চায় অতীত দিনের স্মৃতি। পুরানো কথা আর বিগত কাহিনী।

ষ্টুডিওতে অন্য কোন' তৃতীয় পক্ষের প্রবেশ-অধিকার ছিল না। অমলেশের সাধনপীঠ ষ্টুডিওর আলো-ঝলমল কাচঘরে মল্লিকা। সময়ের শাসন নেই, ঘড়ির কাঁটার তর্জনী-সঙ্কেত নেই, বাধা নিষেধের বালাই নেই—নৈকট্যলাভের অফুরন্ত অবকাশ।

একের পর এক স্কেচ্ আঁকছে অমলেশ। শিল্পপ্রতিভার পরীক্ষা চালায় যেন সে। ষ্টাডি করে স্বভাবকোমল নারীমূর্তির অ্যানাটমি। অমলেশের হাতের সামান্য ক্রেয়নে কাগজ আর ক্যানভাসে জন্ম নেয় একেক ভঙ্গীর একেক মূর্তি। তারপর রঙ চাপায় মনের মত। জল আর তেলরঙ।

ষ্টুডিওতে অমলেশ শিল্পী। মল্লিকা তার নয়নাভিরাম মডেল। সেই সোনার দিনগুলি যে আজ কোথায় হারিয়ে গেল!

ব্যথাভরা করুণ হাসির আভাষ বিশাখার বিশীর্ণ মুখে। গুমরে ওঠে বুক। ক'বার জোরে জোরে ফুঁপিয়ে নেয় কান্নার আবেগে। অসহনীয় এক কষ্টের জ্বালা ধরে অঙ্গে অঙ্গে। বিশাখা বললে,—

তুমি নার্ভাস, আমিও যে তাই। আমার মাথায় যেন কিছু ঠিক থাকছে না আর। এলোমেলো হয়ে গেছে সব।

—চন্দন কৈ বিশাখা? একবাটি শ্বেতচন্দন চাই। মল্লিকা বললে প্রায় চুপিচুপি। বললে,—ফুল আনতে গেছে কি?

—হ্যাঁ। শুধু সাদা ফুলের অর্ডার দিয়েছি। বিশাখার কাঁপা কাঁপা কথা। বললে,—সাদাফুল সবচেয়ে প্রিয় তার। সবচেয়ে আদরের।

শূন্য ষ্টুডিও চোখে পড়লো মল্লিকার। ছাদের দিকে একখানা কাচঘর। অমলেশের কাছে স্বর্গের সমতুল্য ঐ ষ্টুডিও আজ যেন খাঁ খাঁ করছে। দাঁড়ানো ইজেলে একখানি অসম্পূর্ণ ছবি। বাঙলা দেশের সবুজ শ্যামল গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য। আঁকতে আঁকতে অসুখ ধরা পড়ে অমলেশের। ছবিতে রঙদান শেষ হয় না।

ষ্টুডিওতে আরও অনেক ছবি। এখানে সেখানে টাঙানো, দেওয়াল প্রায় দেখা যায় না বললেই হয়। তেল আর জলরঙের ছবি। পোর্ট্রেট চেনা অচেনা মুখের।

বাষ্ট্ আর লাইফ্ ষ্টাডি। আবক্ষ আর আপাদমস্তক আকার বিভিন্ন ছবিতে! মুরাল আর টেম্পেরা নানা জাতের। ষ্টীল লাইফ। ল্যাণ্ডস্কেপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের! আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, ষ্টুডিও যেন একটি ছোটখাটো আর্ট গ্যালারী।

প্রতিটি শিল্পনিদর্শনে অমলেশের শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। কোন' দেশী বা বিদেশী খ্যাতিমান শিল্পীর শিল্পধারার অনুকৃতি কোথাও খুঁজে মেলে না। অমলেশের অঙ্কনপদ্ধতিতে অন্যের প্রভাব নেই। ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন বা গ্রীসের শিল্পধাবার অন্ধ অনুকরণকে কখনও মন থেকে গ্রহণ করতে পারলো না অমলেশ। সকল দেশের ধারাকে মিলিয়ে মিশিয়ে অমলেশ সৃষ্টি করেছে এক অভিনব

টেকনিক। তারই প্রতিচ্ছায়া ফুটে উঠেছে প্রত্যেক ছবিতে।

কিন্তু কোথা থেকে এক মরণ-ব্যাধি এসে ধীরে ধীরে গ্রাস ক'রলো অমলেশকে।

ডক্টর-বৈদ্য হার মানলেন। চিকিৎসায় ফল হয় না কিছুই। মুঠো মুঠো মোটা টাকার অঙ্ক অপচয়ের খাতায় লিখতে হয়। খরচ বৃথা যায়, ব্যর্থ হয়। বাঙলা দেশের একটি শিল্পী-প্রতিভা অকালে ঝ'রে পড়ে। কিম্বা কীট-দংশনে ছিন্নভিন্ন হয়েছে।

নিশ্চুপ ষ্টুডিওটা আজ খাঁ খাঁ করছে।

কোথাও স্থির থাকতে পারে না মল্লিকা, মনের চাঞ্চল্যে কখন এসে এক ফাঁকে ব'সে প'ড়েছে নিরালা ষ্টুডিওতে। পাছে শব্দ হয় তাই একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে ব'সেছে। দুই হাতে চিবুক রেখে দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছে ছবিতে ছবিতে। রঙ আর রেখার বাহার-বিন্যাস নিরীক্ষণ করছে কি মল্লিকা! বুকে তার শোকের তুফান উঠেছে। চিরবিরহের অন্তর্জ্বালায় ব্যথার কাঁটা ফুটেছে থেকে থেকে। বড় বেশী দ্রুত লয়ে বেজে চ'লেছে বুকের স্পন্দন। মল্লিকার চোখের শেষ থেকে জলের ধারা নেমেছে এতক্ষণে। সকলের অলক্ষ্যে।

কাঁদতেও যেন মানা আছে মল্লিকার। দেখিয়ে শুনিয়ে কান্নায় বাধা আছে।

বিশাখার চোখে পড়লে লজ্জার অন্ত থাকবে না যেন আর।

দেখতে দেখতে বেলা দুপুরের দিকে এগিয়ে যায়।

কত কে এলেন গেলেন। অমলেশের আত্মীয় আর স্বজনবন্ধু। পরিণত বয়সের কারও মৃত্যু হ'লে হয়তো কেউ এত বেশী বিচলিত

হতেন না। একেবারে অসময়ে অমলেশের শেষ দিনটি যে এমন ঘনিয়ে আসবে, তা যেন কল্পনার অতীত।

তবুও কেউ যেন কাছে এগোতে সাহস পায় না। অমলেশের কাছে গিয়ে বসতে চায় না কেউ। যাঁরা আসছেন তাঁরা দুয়োরের বাইরে দাঁড়িয়ে একবার শুধু চোখের দেখা দেখছেন অমলেশকে। তারপর ধীর পদক্ষেপে বিদায় গ্রহণ করেছেন। কেউ যেন চোখে দেখতে পারছেন না এই অসহ্য দৃশ্য।

ফুলের রাশি, এক পাশে জমা হ'য়ে চলেছে। শেষ দেখার সঙ্গে শেষ উপহার।

শ্বেতপদ্মের রীদ্! রাশি রাশি সাদা ক্রিসেন্থিমাম মৃদু মন্দ সুগন্ধ ছড়িয়েছে। ছন্দহারা কবিতা, সুরকাটা গানের মত, ফুলের সুরভি এখন বেসুরো ঠেকছে যেন!

—বৌ।

ঘরেব বাইরে থেকে মিহি কণ্ঠে ডাকলেন লীলাবতী।

সাড়া দেয় না বিশাখা। সে তখন পোষাক বদল করছে অমলেশের। আজ আর কোন লজ্জা মানবে না যেন বিশাখা। খেয়াল নেই তার, আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছেন কত বয়স্ক পুরুষ আর মহিলা। যতেক গুরুজন এই পরিবারের। বিশাখার মাথা থেকে খ'সে পড়েছে গুণ্ঠন, পিঠ থেকে নেমে গেছে শাড়ীর আঁচল। আলুলায়িত কেশরাশি পিঠে ছড়িয়ে আছে কালো মেঘের মত।

বিশাখার সম্পর্কের এক ভাই এটা সেটা এগিয়ে দেয়। খাট সাজিয়ে দিতে থাকে পরিপাটি। কখন একখানা কাঠের বাহারী একক-শয্যা-খাট এসে পড়েছে। ঘরের সমুখের দালানে খাটের চতুর্দিকে ফুলের বেড়া জড়ানো হচ্ছে। চার কোণে ফুলের

ফোয়ারা। সারি সারি মালার হালি ঝুলছে খাটের চার পাশ থেকে।

—বৌমা।

আবার সেই ক্ষীণ কণ্ঠের ডাক। লীলাবতী বাঁধহীন চোখের জল মুছতে থাকেন। অমলেশকে শেষ সাজ সাজতে দেখে আবার একটা কান্নার জোয়ার ওঠে লীলাবতীর দুই চোখে।

সাড়া দেয় না বিশাখা। শুধু নজর ফেরায়। সে তখন চন্দনের রেখায় স্বস্তিকচিহ্ন এঁকে চলেছে অমলেশের হিমশীতল কপালে!

চোখাচোখি হ'তেই লীলাবতী বললেন,—বৌমা, তোমার একটা ফোন এসেছে।

—কে? বিশাখা শুধায় কেমন যেন অস্বাভাবিক আগ্রহের সুরে! কোথায় যেন একটু শঙ্কা না সঙ্কোচ ফুটে উঠে তার কথায়।

—মিষ্টার চৌধুরী। আসতে চাইছেন তিনি। লীলাবতী বললেন ইদিক সিদিক দেখে নিয়ে। বললেন,—কি বলবো বৌমা?

—আসতে মানা করুন তাঁকে। কথা বলতে বলতে উঠে পড়লো বিশাখা। তার মুখে যেন অপ্রস্তুততার লালিমা। লীলাবতীর কাছে এগিয়ে যায় বিশাখা। বলে,—আমার নাম বলুন পিসীমা। বলে দিন, না এলেও চলবে এখন। তা ছাড়া এসে কিই বা ক'রবেন তিনি।

আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না লীলাবতী। ফোনে কথা বলতে চললেন।

ক্ষণেকের মধ্যে নিজেকে সামলে নেয় বিশাখা। ফ্যাকাশে মুখখানা আঁচল চেপে চেপে মুছে নেয়। কয়েক রাত পর পর জেগে কাটিয়ে দিতে হয়েছে বিশাখাকে। বিনিদ্রার রোগীর মত

রাত্রির পদক্ষেপ শুনতে হয়েছে, অমলেশের বিছানার পাশে থেকে। সেবা আর শুশ্রূষার কাজে আত্মমগ্ন বিশাখা কোথা দিয়ে এতগুলি দিন কেটে গেছে জানতে পারে না।

ঘরের বাইরে থেকে গলা খাঁকারীর শব্দ শোনা যায়। পুরোহিত এসে দাঁড়িয়েছেন। পুরুষানুক্রমিক পৌরোহিত্যের কাজ করছেন পুরোহিত-বংশ। পুরু-কাচ-চশমার মধ্যে বৃদ্ধের আঁখি-তারকা জ্বল জ্বল করছে। বোধ করি তিনিও কেঁদেছেন। চোখে লালাভ প্রান্তে অশ্রুর চিকন। পুরোহিত বাষ্পরুদ্ধ সুরে কথা বললেন। বললেন,—বৌমা, একটি কথা বলি। অধিক বিলম্ব হ'লে সূর্যাস্তের পূর্বে শ্মশানযাত্রীদের প্রত্যাবর্তনে বাধা পড়বে। সুতরাং আর কালক্ষেপ না ক'রে—

—আমাকেও যেতে হবে? বিশাখা বললে সুর নামিয়ে।

পুরোহিত বললেন,—হ্যাঁ মা ঠাকরুণ। তুমি ব্যতীত অন্যের অধিকার কোথায়?

খানিক স্তব্ধ হয়ে থাকে বিশাখা। কি যেন ভাবতে থাকে আকাশ পাতাল। মনটা বেঠিক হয়ে গেছে যেন। সেই সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা খেই হারিয়ে ফেলছে যখন তখন। একটা কিছু ভেবে ঠিক করতে পারে না বিশাখা। অধিকক্ষণ ভাবতে পারে না একটানা। সত্যিই কেমন যেন দিশাহারার মত দেখায় বিশাখাকে। সে যেন এক হালভাঙা তরী। মাঝ-দরিয়ায় ভেসে চলেছে প্রবাহ-আবর্তে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সাধ্য নেই তার।

পুরোহিত আবার বললেন,—মা ঠাকরুণ, ভগ্নমন হ'লে চলবে না। বিপদ উদ্ধারের কর্ম ক'টা শেষ করতে হবে। আমাদের মনুষ্যধর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিন্দুর শেষকৃত্য। দেহত্যাগের

পর অবিনশ্বর মানবাত্মা শান্তি চায়। অবিমিশ্র ও নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি। ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

কম্পমান কণ্ঠে থেমে থেমে কথাগুলি শেষ করলেন পুরোহিত। কথা বলতে তিনিও যেন কষ্টবোধ করছেন। চিরশান্তির মন্ত্র-উচ্চারণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থানত্যাগ করলেন।

ফুল-বিছানো শয্যায় অমলেশকে তখন শুইয়ে দেওয়া হচ্ছে।

রাজবেশ প'রেছে অমলেশ। বিশীর্ণ মুখে তার একটা রহস্যময় হাসি ফুটেছে। পিছনে ফেলে যাওয়া পৃথিবীর প্রতি ব্যঙ্গ না বিদ্রূপের উপহাস্য কে জানে। আয়ত চোখ দু'টি প্রায় নিমীলিত। যেন আর চোখ মেলে দেখতে চায় না নারকীয় পৃথিবীকে। রোগ-ব্যাধি-জরায় আর বিষাক্ত সভ্যতায় কি কদর্য রূপই না হয়েছে এই গ্রহটার!

একটা চাপা কলগুঞ্জন ওঠে। শীত শীত হাওয়া বইতে শুরু করে হঠাৎ।

শোক-সন্তপ্তর দল নিঃশব্দে এসে ভীড় জমায় খাটের আশে-পাশে। ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা যায় এখানে সেখানে। ত্রস্ত ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায় সমাগত মহিলাদের মাঝে।

বিশাখার চোখের জল যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। কেমন কঠোর-কঠিন দেখায় বিশাখাকে। রুক্ষ্ম চুলের রাশি পিঠ ছাপিয়ে নেমেছে। সীঁথিতে সিঁদুরের লাল রেখা এখনও স্পষ্ট আর প্রকট।

মুখ ঢাকলো বিশাখা। অমলেশের দুই পায়ে মাথা রেখে ব'সে পড়লো।

তার রাশি রাশি মেঘবরণ চুলে ঢাকা পড়েছে অমলেশের পা। জরিপাড় ধুতির যত্নে কুঞ্চিত কোঁচার প্রান্তভাগ। শব্দহীন কান্নায়

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে বিশাখা। তার উর্ধ্বাঙ্গ কাঁপছে ক্রন্দন-আবেগে।

স্তব্ধ আর গম্ভীর মল্লিকা। এক পাশে আছে সে। সঙ্গোপনে দাঁড়িয়ে আছে এক দুয়োরের পাল্লা ধ'রে। কান্নাকে যেন কি .এক শাসনে থামিয়ে রেখেছে মল্লিকা। মনে মনে ঠিক ক'রেছে সে, অমলেশ চ'লে যাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে সেও ত্যাগ করবে এই গৃহ অঙ্গন। আর কখনও আসবে না হয়তো। তাই যেন এতক্ষণ ধ'রে অমলেশের ষ্টুডিওতে লুকিয়ে ব'সে দেখছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেখছিল অমলেশের আঁকা প্রত্যেকটি ছবি। রেখা আর রঙের কি বিজ্ঞ ব্যবহাব। রঙেব লড়াই নয়। সংযত বর্ণবিহার।

গা কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস চলেছে। ফিস ফিস কথা বলছে কারা যেন। বাইরে হাওযা বইছে সাঁ সাঁ। ফুঁপিয়ে কান্নাব অনেকগুলি শব্দ ক্ষণেকের জন্য একটু জোরালো হয়ে ওঠে।

বিশাখাকে পেছনে বেখে অমলেশ এগিয়ে চললো। মাটিতে তখন লুটিয়ে পড়েছে বিশাখা।

শীত শীত বাতাস চলেছে। ফুল আব এসেন্সেব গন্ধে বাতাস যেন ঈষৎ ভারাক্রান্ত। বাশি রাশি ক্রিসেন্থিমাম আব শ্বেতপদ্মের স্তূপ থেকে সুগন্ধ আসছে। কেমন যেন খাপছাড়া ঠেকছে শোকের স্তব্ধতায়।

তারপর? তারপর আবও কয়েকটা মাস কেটে গেছে দেখতে দেখতে।

হাস্যময়ী বিশাখা হাসতে যেন ভুলে গেছে একেবারে। একা একা থাকে নিজের ঘরে। মুখে তার সর্বক্ষণ বিষাদ আর গাম্ভীর্য।

সেই বিয়ের আগের কুমারী-দেহ আবার যেন ফিরে পেয়েছে বিশাখা। সীঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। দুই হাতে গোছা গোছা সোনার চুড়ীর বদলে এক জোড়া সরু বালা অতি সাধারণ। আলমায়রায় থাকে থাকে রঙীন শাড়ী এখনও সাজানো। অমলেশ রঙের সাধনায় সিদ্ধহস্ত ছিল। তাই বিশাখার শুভ্রদেহে রঙের অভাব যেন অসহ্য লাগতো অমলেশের। দোকান ঘুরে ঘুরে যত সব রঙীন শাড়ী এনে দিয়েছে যখন তখন। তাও ফিকা নয় একটিও, ঘোর ঘোর রঙ শাড়ীর। ঘনলাল, সমুদ্রনীল, হলুদ-বাসন্তী, মিশ্‌কালো।

বিশাখাকে ইদানীং সহসা দেখলে চোখের দৃষ্টি থমকে থাকে।

আধ-ফোটা শ্বেতপদ্ম, না ফুটতেই ঝ'রে গেছে অকালে। শোকের এক প্রচ্ছন্ন প্রতিমূর্তির মত দেখায় বিশাখাকে। নিরাভরণা শুভ্রবসনা রূপসী, ফ্যাকাশে দিবাকাশে চাঁদের মতই বেমানান।

কাছে এগোতে সাহস হয় না কারও।

শুধু ঐ যা লীলাবতী পিসীমা মাঝে-মিশেলে আসেন দুয়োরের কাছ পর্যন্ত। বাইরে থেকেই ডাক দেন। কথা বলেন। এই ক'মাসে লীলাবতীর মাথার সমুখভাগের চুলে পাক ধ'রে গেছে ভেবে ভেবে। তিনিও কেমন নীরব হয়ে গেছেন যেন। তিনিও ঘরের মধ্যে থাকেন বন্দিনীর মত। সাঁঝ-সকালে চোখে রূপালী ফ্রেমের চশমা এঁটে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করেন। অবরে সবরে ছাদে উঠে পড়েন। স্নানের পর ভিজা চুল শুকাতে ওঠেন। ঘরের চার দেওয়াল অসহ্য হয়ে উঠলে মুক্ত আকাশের তলায় খানিক থেকে মাথাধরাটা ছাড়িয়ে আসেন।

অমলেশ চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লীলাবতীর ভবিষ্যৎ আঁধারে ঢাকা পড়ে গেছে। একটি মাত্র মেয়ে তাঁর। প্রবাসীর ঘরে

পড়েছে। বিদেশিনীর মত একেক যুগ পরে আসে কলকাতায়। আসে সুদূর এক মালয় থেকে। লীলাবতীর জামাই সেখানে সরকারী হাসপাতালের সার্জন। হাতযশ এমনই যে ছুটি মেলে না পূজা-পার্বণে। সপ্তাহে একখানি অন্ততঃ চিঠি আসে মেয়ের হাতের লেখা। লীলাবতী চিঠির জবাব দেন। কিন্তু ইংরেজীতে ঠিকানা লিখতে পারেন না লীলাবতী। অথচ বাঙলা ভাষা মালয়ে প্রায় অচল বললেই হয়।

আজ যেমন ঘরের বাইরে থেকে লীলাবতী মিনতির মিহি সুরে কথা বললেন। বলেন,—বৌমা, ঠিকানাটা যদি একটু কষ্ট ক'রে লিখে দাও অর্চনার। চিঠি না পেলেই মেয়েটা আবার ব্যস্ত হবে। হয়তো টেলিগ্রামই ক'রে বসবে।

অস্ফুট হাসির আভাষ খেলে বিশাখার পাৎলা ঠোঁটে।

কেমন যেন করুণ হাসিটুকু। দেখলে মায়া হয়। বিশাখার সম্মতির ভঙ্গিমা ফোটে। বলে,—এ আর নতুন কি পিসীমা। খামটা পাঠিয়ে দিন এখুনি। লিখে দিচ্ছি।

সকালে কাঁচা রৌদ্র জানলার গরাদে ফালি ফালি হয়ে লম্বমান ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের মোজেকের মেঝেয়। পূব দিকের তিনটে জানলাই উন্মুক্ত।

লীলাবতীর বুক ছ্যাঁৎ করলো আবার। স্পষ্ট দিনের আলোয় বিশাখার শুভ্রসীঁথি, হঠাৎ যেন তাঁর চোখে পড়লো। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন তখনই। অমলেশ নেই, স্মৃতিতে ভেসে উঠলো অকস্মাৎ।

কি একখানা বই পড়তে পড়তে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে বিশাখা, পিসীমার কথা শুনে। কথার মাঝে একেক ফাঁকে লক্ষ্য

করেছেন লীলাবতী। সোজাসুজি না তাকিয়ে আড়চোখে দেখেছেন, বিশাখার মুখে স্নো আর পাউডারের প্রলেপ। চোখের শেষপ্রান্তে সূক্ষ্ম কালো রেখা। সুর্মা নয়, কালো মার্কিনী পেনসিলের টান। উগ্র এক এসেন্সের সুগন্ধ ভাসলো বিশাখার ডবল জামা থেকে। রাশি রাশি চুলে গন্ধ তেল মেখেছে। আজই সকালে আবার চায়ের সঙ্গে নাকি খান কয়েক পাঁউরুটির টোষ্ট খেয়েছে বিশাখা। ঝি লাগিয়ে দিয়ে এসেছে লীলাবতীর কানে।

শুধু যা সিঁদুর নেই সীমন্তে। গা ভর্তি গয়না নেই।

লীলাবতী ফিরে যেতে যেতে থামলেন। বললেন,—বৌমা, কাল রাতে কখন বাড়ি ফিরেছো? আমি কিছুই জানতে পারিনি, ঘুমিয়ে পড়েছি কখন।

একটুকু অপ্রস্তুত হয় না বিশাখা। জবাব দেয় সঙ্গে সঙ্গে। সহজ স্বাভাবিক সুরে। বলে,—দশটা বেজে যাওয়ার পরে পিসীমা। আর বলেন কেন। সিনেমা দেখতে গিয়ে সে কি ফ্যাঁসাদ। শো শেষ হ'তে অডিটোরিয়ামের বাইরে বেরিয়ে দেখি রাস্তায় এক কোমর জল দাঁড়িয়ে গেছে। সে কি বৃষ্টি পিসীমা!

—বৃষ্টি! বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন লীলাবতী। বলেন,—তারপর?

—তারপর আমরা একটা হোটেলে গিয়ে বেশ খানিক অপেক্ষা করি। সেখানে উপরি উপরি কয়েক পেয়ালা কফি খেয়ে খেয়ে সময় কাটাই।

—শুধুই কফি? আর কিছু নয়?

—হ্যাঁ। গাড়ীতো পিসীমা প্রায় অচল। বিশাখা যেন এক অ্যাডভেঞ্চার বলে চ'লেছে ক্ষীণ হাসি মুখে ফুটিয়ে। বললে,—গাড়ীতে ষ্টার্ট হয় না। ডিস্ট্রিবিউটরে জল পড়েছে।

তারপর মিষ্টার চৌধুরী অনেক চেষ্টাতে গাড়ী সারিয়ে ষ্টার্ট করলেন। শেষ পর্যন্ত জলের ভয়ে এ রাস্তা সে রাস্তা ঘরে বাড়ি পৌঁছেছি।

আর শুনতে চান না লীলাবতী। নিজের ঘরের দিকে এগোতে থাকেন ধীরে ধীরে। পিসীমার মুখে কেমন এক বিষন্নতা দেখা দেয়। হতাশ চাউনি ফোটে চোখে। কেন কি জানি, অমলেশের মুখখানি লীলাবতীর মাসনপটে ভেসে ওঠে আবার। তখনই চোখ দু'টি ছলছলিয়ে উঠলো।

লীলাবতী নিজের ঘরে যেতে একটা স্বস্তির শ্বাস ফেললে বিশাখা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন। মিথ্যা কথাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে কত কষ্টই না হয়! বিশাখা একেই পারে না বানিয়ে কথা বলতে। মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া তার স্বভাবে নেই। কিন্তু আজ আব উপায় নেই। মিথ্যা না বললে পিসীমা অশান্তির আগুনে জ্বলতে থাকবেন। একে তাকে ডেকে বলবেন বিশাখার কীর্তিকলাপ।

কিন্তু সত্যিই নাকি কোন দোষ নেই বিশাখার। তার আপত্তি টি`কতে পায়নি। মিঃ চৌধুরীর কড়া মেজাজ আব উগ্র প্রকৃতিতে দস্তুরমত ভয় করে বিশাখা। ভদ্রলোকের কখন যে কি খেয়াল হয় কেউ বলতে পাবে না। এখন তাঁর খেয়াল হয়েছে, শোকাতুরা বিশাখাকে কোন্ উপায়ে খুশী রাখবেন। তার মুখে হাসি ফোটাবেন। বিশাখার ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করবেন। মরা নদীতে আবার বান ডাকবে।

সেদিন কথায় কথায় লীলাবতী কেমন এক সন্দেহের সুরে

বললেন,—আচ্ছা বৌমা, মিষ্টার চৌধুরী ভদ্রলোকটি কে? তোমাদের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক? কত দিনের পরিচয়?

কথার উত্তর দেওয়ার আগে খুব খানিক হেসে নেয় বিশাখা। পর পর কতকগুলো বড় বেয়াড়া প্রশ্ন ক'রেছেন লীলাবতী। তাঁর ব্যগ্র আর গম্ভীর কথার সুর যাতে সহজ হয় তাই হাসির ছল ধরে বিশাখা। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বললে,—আর বলেন কেন পিসীমা! ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উঠেছিল সব প্রথম। আমার বাবা আর মা রাজী হ'লেন না নানা কারণে। তখন থেকেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়। তা ছাড়া মিষ্টার চৌধুরীর সঙ্গে আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে।

লীলাবতী খুশী না অখুশী হ'লেন কিছুই বোঝা যায় না। পিসীমা বললেন,—লোকটির মুখ চোখ দেখলে কেমন ভয় ভয় করে। দেখো বৌমা, সোনা ফেলে আঁচলে যেন—

আবার একবার হাসে বিশাখা। বলে,—কি যে বলেন পিসীমা!

লীলাবতী বললেন,—ভয় পাই বৌমা। ঘি আর আগুন এক হ'তে দেখলেই ভয় হয় আমার।

খিল খিল হেসে ওঠে বিশাখা। সলাজ হাসিতে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে পিসীমার ভয় আর আশঙ্কাকে।

সত্যিই দোষ নেই বিশাখার। টেলিফোনে গতকাল শিশুর মত কাকুতি মিনতি জানিয়েছে মিষ্টার চৌধুরী। শিশুর চাঁদ চাওয়ার মতই বায়না ধ'রেছে যেন। একটিবার দেখা দাও। কথা রাখো। এনগেজমেণ্ট ফেল্ ক'রো না, লক্ষ্মীটি।

অগত্যা কথা রাখতে হয় বিশাখাকে। ততটা নির্দয় নিষ্ঠুর হ'তে পারে না সে, কেন কে জানে? দুয়োরের ভিখারীকে যেন ফেরাতে পারে না কঠোর প্রত্যাখ্যানে।

প্রথম দেখা হ'তেই চৌধুরী বললে,—এ কি! এ কেমন সাজ? সাদা শাড়ীতে তোমাকে একেবারে বেমানান দেখায় বিশাখা।

—উপায় কি আর? বিশাখা ফিসফিসিয়ে কথা বলে। কাফে ডি লুক্স তখন হাসি আর কনসার্টে মুখর হয়ে আছে। একটা টেবিলও আর ফাঁকা নেই, চেয়ার শূন্য নেই একটা। নিগ্রো বাজিয়ের দল নাচের সুর বাজিয়ে চলেছে। পিয়ানোর সঙ্গে ব্যাঞ্জো আর চেলো বেজে চলেছে।

সাদা মলমলের শাড়ীতে অপরূপ দেখায় বিশাখাকে। শাড়ীর জমিতে সোনা-ফুলের মত হলুদ রঙের ছাপানো তারাফুল। রূপালী জরির সাদা ব্রোকেডের ব্লাউসে হোটেলের উজ্জ্বল আলো পড়ছে।

সেই বিখ্যাত গানের সুরে কনসার্ট বেজে উঠলো হঠাৎ। করুণ আবেগভরা গানের ভাষা। প্রেমিকা বলছে,—ডার্লিং, মাই ডার্লিং ডোণ্ট্ বি অ্যাঙ্গ্রি।

প্রিয়. রাগ ক'রো না প্রিয়। সমাগত অতিথিবৃন্দ পা নাচিয়ে নাচিয়ে তাল রাখছে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে।

হোটেলের উর্দিপরা বেয়ারা এসে দাঁড়ায় সেলাম জানিয়ে। তার হাতে জয়পুরী সূক্ষ্ম কারুকাজের রেকাবী একখানি। রেকাবীতে প'ড়ে আছে হোটেলের মেনু। পানীয় আর খাদ্যতালিকা। স্পেশাল ডিসের নাম আর দাম।

তালিকাটি ছোঁ মেরে যেন তুলে নেয় মিঃ চৌধুরী। বলে,—বিশাখা, তুমি কি খেতে চাও? স্যাম্পেন? শেরী?

—উঁহু। উঁহু। উঁহু। বিশাখা সলজ্জায় বললে,—ও নো। নো। নো।

—তবে কি খাবে? আমি তো নিজে হুইস্কি ছাড়া কিছুই মুখে তুলি না।

—এক পেয়ালা কফি। ব্যস আর কিছু নয়। বিশাখা ক্ষীণ হেসে কথা বলে।

—একেবারে নিরামিষ্যি? মিঃ চৌধুরী ব্যঙ্গের সুরে বললে। ঠোঁটের প্রান্তে ঝুলন্ত সিগারেটে লাইটারের জ্বলন্ত স্পর্শ লাগিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে,—আমি কিন্তু ভীষণ ক্ষুধার্ত। নিদেন পক্ষে এক প্লেট চিকেন রোষ্ট খেতে হবে আমাকে।

হাসলো যৎসামান্য বিশাখা। বললে,—আপনার যা মন চায় আপনি খেতে পারেন। বিনা দ্বিধায়।

মিঃ চৌধুরী কেমন বিজাতীয় ধরনে অর্ডার পেশ করলে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে,—বেয়ারা, কফি, হুইস্কি টল্, চিকেন রোষ্ট্ সিঙ্গ্ল প্লেট, আউর ক্রীমরোল।

কে কোথায় আছে তার ঠিক নেই। চেনা জানা কেউ যদি থাকে, তাই চোখ ফিরিয়ে দেখতে হয় বিশাখাকে। কেউ দেখলে আর রক্ষা থাকবে না। দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে মুখে মুখে। একেই আত্মীয়-স্বজনের কড়া নজর আছে। বিশাখার মতিগতির বদল হয় কিনা অলক্ষ্যে থেকে দেখছে অনেকেই। খোলামেলা হোটেলে বিশাখা, পৃথিবীর আরেক আশ্চর্যের মত লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠবে সে। নানা কথার রটনা হবে। বিশাখার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কত কে আসবে তাকে কথা শোনাতে। আসবে উপদেশ দিতে বিনামূল্যের। পরিত্রাতার মত আসবে বিশাখাকে বেপথ থেকে উদ্ধার করতে।

পর পর ধোঁয়ার রিং ছুঁড়ছে চৌধুরী। ছোট ছোট চাকা একেকটা, চৌধুরীর মুখ থেকে বেরিয়ে বিশাখার মুখে চোখে পরশ বুলিয়ে ক্ষণেকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। চৌধুরীর মুখে কেমন কুটিল চাউনি ফুটেছে। পাকা বৈজ্ঞানিকের মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে বিশাখাকে।

—তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হবে। বিশাখা কথা বললে প্রায় চুপি চুপি। কফির পেয়ালায় চামচ ডুবিয়ে। চামচে চিনির টুকরো লুডোর ছকের আকার।

মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ভ্রু কুঁচকে চৌধুরী বললে,—কেন? এত তাড়া কেন?

—এখান থেকে বেরিয়ে মিউজিয়ামে যাবো। বিশাখা কথা বলছে চামচে ঘোবাতে ঘোরাতে।

—কেন? মিউজিয়ামে কি দেখবে এখন? অতীত ইতিহাসের চর্চা করছো না কি ইদানিং? কথার শেষে চৌধুরী হাসলো। তাচ্ছিল্যের হাসি।

—না। ইতিহাসের প্রতি আমার তত আস্থা নেই। আমি যাবো সরকারী আর্ট একজিবিশন দেখতে। বিশাখা কফির পেয়ালা মুখের কাছে তোলে।

—ইস্! আজকের ইভিনিংটা মাঠে মারা যাবে দেখছি। চৌধুরীর কথায় হতাশ সুর। বিরক্তির আঁকাবাঁকা রেখা ফুটলো কপালে। চৌধুরী বললে,—না। আজ আর একজিবিশনে গিয়ে কাজ নেই।

—না। আমাকে যেতেই হবে। অমলেশের আঁকা খান দুয়েক অয়েল পেন্টিং আছে। কেমন মানিয়েছে দেওয়ালে ঝুলিয়ে, তাই একবার দেখতে যাওয়া।

—আগামী কাল যেতে পারো। আজ আর কেন?

—না। আমার ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছে, এখনই গিয়ে দেখে আসি। দেরী সইছে না।

অগত্যা একান্ত নিরাশায় হুইস্কির গ্লাস তুললো চৌধুরী। কাচের আধারে সোনালী জলে সোডার বদ্বুদ ফুটছে উর্ধ্বমুখে। চৌধুরী বললে,—তোমার যা খুসী।

ইতিউতি দেখছে বিশাখা। কোন' পরিচিতের চেনামুখ সহসা চোখে পড়ে যদি। কে জানে, কে বা কারা হয়তো দূর থেকে লক্ষ্য করছে বিশাখাকে। দেখছে হয়তো অদম্য কৌতূহলের সঙ্গে। হয়তো আড়ি পেতে শুনছে বিশাখার মুখের কথা। দেখলে এখনই টি টি পড়ে যাবে চতুর্দিকে। সমাজের মাথা ঘুরে যাবে। রাতারাতি অস্পৃশ্য হয়ে পড়বে সে। বিশাখার আর এক নাম হবে অচ্যুৎকন্যা।

ক্রীম রোলের প্লেট একপাশে সরিয়ে রাখলো বিশাখা। কফির পেয়ালা মুখে তুললো। চিনি কম হয়েছে, পেয়ালা নামিয়ে চিনির ছক তুললো কাঁটায়। বললে, আকাদেমীর একজিবিশনে অমলেশ একবার গভর্নরস্ গোল্ড মেডেল পেয়েছিল। ছবির সাবজেক্ট ছিল 'নানা ফুলের সাজি।' স্টীল লাইফ।

ছুরি আর কাঁটা তুলে নিয়েছে চৌধুরী কখন। ভিনিগার আর ঝালজলে ভাসছে একখণ্ড রোষ্ট। আলু আর কড়াই শুঁটি। কুঁচি কুঁচি পেয়াজ। চৌধুরীর মুখে যেন কথা নেই। কথা শোনারও ফুরসৎ নেই যেন। ছুরি আর কাঁটা হাতে যুদ্ধ চালিয়েছে চৌধুরী। সামান্য একখণ্ড মাংস প্রতিপক্ষ। মাঝে মাঝে বাম হাতে হুইস্কির গ্লাসটা তুলে কণ্ঠ ভিজিয়ে নেয়। এমন শীতের সন্ধ্যায় ঘাম ফুটছে চৌধুরীর ঘনশ্যাম কপালে। নেকটাইয়ের আঁট বাঁধন আলগা না করলেই নয় আর।

কফির পেয়ালা মুখের কাছে। বিশাখা দেখছে এধার সেধার। এ টেবল সে টেবল। দেখে দেখে একজন পরিচিত আত্মজনকেও দেখতে পায় না। আশে পাশে পাঞ্জাবী আর ভাটিয়া পুরুষ রমণী। উচ্ছ্বসিত এক এক দল। বিশাখার ঠিক সমুখে একখানা বিরাট ডাইনিং টেবলের চারিদিকে হয়তো একই পরিবারের সকলে একত্র মিলিত হয়েছে আজ সায়াহ্নে। কাদের যেন বিবাহ-বার্ষিকী পালিত হচ্ছে সাড়ম্বরে। কণ্ঠে মালা ঝুলিয়ে দম্পতি ব'সে আছে। টেবলের মধ্যমণি তারা দু'জন। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হয়তো জাতিতে।

চোখ ফিরিয়ে নেয় বিশাখা। কনসার্টে ভেসে আসা বাজনার সুর শুনতে থাকে নিমীলিত চোখে।

কনসার্টে সুর বেজে চলেছে বিলাতী গানের। প্রিয়, রাগ ক'বো না প্রিয়—

পিয়ানো, ব্যাঞ্জো, চেলো, কনসার্টিস্টার সঙ্গে খঞ্জনী বেজে উঠছে থেকে থেকে। ড্রামে আঘাত পড়ছে মিহি তালে।

—হাত চালিয়ে নিতে হবে। একজিবিশন বন্ধ হয়ে যাবে নয়তো।

আবার কথা বললে বিশাখা। কফির পেয়ালার আড়াল থেকে কথা ভাসলো ব্যগ্র কণ্ঠের।

রোষ্টের শেষ টুকরো মুখে তুলেছে চৌধুরী তখন। হুইস্কির গ্লাসেও পানীয় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। চৌধুরী বাম হাতে গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে মুখের খাদ্যবস্তুকে ঠেলে দেয় যেন।

কাঠের পুতুল আবার কখন এসে দাঁড়ায়। হোটেলের বেয়ারা। তার মাথায় আর কটিদেশে পেতলের নাম-প্লেট চক চক করে। সাদা জিনের পোষাক আরও শুভ্র দেখায় হোটেলের উজ্জ্বল আলোয়। বেয়ারার হাতে ক্রোমিয়ামের রেকাবী।

—ওয়েট্ ওয়েট্। চৌধুরী কথার শেষে গ্লাস তুললো মুখে। যেন কতকালের অতৃপ্ত তৃষ্ণা, বুকে পুষে রেখেছে চৌধুরী। জলপান করছে যেন সে। দেখতে দেখতে গ্লাস নিঃশেষ হয়ে যায়। পানীয় ফুরিয়ে যায় চোখের নিমেষে।

রূপালী রেকাবীতে একটা টুকরো কাগজ। খানাপানের রসিদ। বেয়ারা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। চোখে নিস্পৃহ দৃষ্টি। ওষ্ঠপ্রান্তে নকল হাসির আভাষ।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলতে থাকে বিশাখা। পার্স বের করে। দু'খানা দশটাকার নোট ছুঁড়ে দেয় রেকাবীতে।

চৌধুরী প্রবল প্রতিবাদের সুরে বাধা দিতে ওঠে। বিশাখা কর্ণপাত করে না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে,—মিষ্টার চৌধুরী আর বেশী দেরী হ'লে আমাকে একলাই এগোতে হবে। আমাকে যেতে দিন।

কনসার্টে তখন আর এক গানের সুর বেজে চলেছে। কেমন যেন করুণ করুণ। বেদনাভরা। ঐকবাদনে বিরহের ধ্বনি শোনা যায়। টানা টানা কাঁপা কাঁপা সুর। কনসার্ট পার্টি বাজিয়ে চলেছে ভিন্‌দেশী এক গান—যার ভাষা দুঃখের। সুর ব্যথাহত।

'প্লীজ রিমেম্বার মি, ওহেন ইউ উইল বি এলোন—'

যখন তুমি একা হবে, তখন আমারে স্মরিও—

বিশাখা তরতরিয়ে এগিয়ে চলে। ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে দেয় ডান বাহুতে। পোষা কুকুরের মত পিছু নেয় চৌধুরী। বিশাখার পাশ থেকে ফিসফিস বলে,—বিশাখা, একটু আস্তে পা চালাও।

জবাব মেলে না। যেমনকার তেমনি চলতে থাকে বিশাখা। সমান দ্রুতগতিতে। যেন এক শ্বেতপাথরের মূর্তি, হঠাৎ সচল হয়েছে। হোটেলের সমাগতদের মধ্যে কেউ কেউ লক্ষ্য করে

বিশাখাকে। শুভ্রতার প্রতীক চলেছে যেন। শুধু যা চোখের তারা কালো। এলোচুলের ঝুলন্ত কালো কবরী পিঠের 'পরে। কালো পেনসিলের রেখা চোখের পাতায়।

আবার বললে চৌধুরী। পিছন থেকে কথা বললে রাগের সুরে। বললে,—বিশাখা, কথা অমান্য ক'রছো কেন?

হোটেল থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে পা দিতেই থেমে যায় বিশাখা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। চৌধুরীর চোখে চোখ পড়তেই অন্য দিকে চোখ ফেরায়। আবার চলতে থাকে মন্থরতম গতিতে।

রাজপথের পাশেই সান বাঁধানো পা-পথ। জনাকীর্ণ। ফেরিওয়ালা আর ভিখারী এখানে সেখানে। পত্রপত্রিকার ষ্টলের সমুখে বই আর সাময়িক পত্রিকার স্তূপ। প্রচ্ছদে প্রচ্ছদে হলিউড তারকাদের নির্লজ্জ ছবি। সামান্য বক্ষবাস, না থাকলেই যেন শোভা পায়। কেমন দৃষ্টিকটু ঠেকে।

চৌরঙ্গীর পা-পথ যেন আন্তর্জাতিক মিলনের পীঠস্থান। দেশী বিদেশী কত জাতের পুরুষ আর নারী আসা যাওয়া করছে। হোটেলের ফটকে ফটকে গাড়ী ভিড় জমছে। বিদেশী পর্যটকের দল দাঁড়িয়ে আছে ভিখারীদের মাঝে। একজন হরবোলা একপাশে দাঁড়িয়ে মুখে দুই আঙুল পুরে ভিন্ন ভিন্ন পাখীর ডাক ডাকছে। কাক, মুরগী, কোকিল আর তিতিরের ডাক ডাকছে। বৌ কথা কও পাখীর হুবহু নকল করছে।

মনুষ্যকণ্ঠে পাখীর কাকলী শুনে শুনে অট্টহাসি হেসে উঠছে বি[illegible]ী সাহেব-সুবোর দল।

—[illegible]লক্‌ মি সার!

—একটা পয়সা। উই আর পুয়োর। হোমলেশ।

—ইনকিলাব্‌ ব্রিটিশ-আমেরিকা!

—ভগবান তোমাদের ভাল করবে, রাজা করবে।

খুচরো পয়সা ছড়িয়ে দেয় বিদেশী টুরিষ্টরা। ফুটপথে ফেলে দেয় অস্পৃশ্যতা বাঁচিয়ে। বলে,—গো অন। যাও, ভাগো।

যন্ত্রচালিতের মত যেন পথ চলছে বিশাখা। সে যেন মূক আর বধির।

চৌরঙ্গীর দক্ষিণপানে এগোতে থাকে বিশাখা। আর খানিক দূর গেলেই মিউজিয়াম! মরাসোসাইটি। যাদুঘর। দূরে পার্ক ষ্ট্রীটের পাঁচ মোড়ে অনেক আলোর জটলা লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞাপনের হোডিংএর রঙীন নিওন আলো জ্বলতে জ্বলতে নিভে যায়। ময়দানের নির্জনতায় মাঝে মাঝে আঁতকে ওঠে মোটরের শাঁখ-হর্ন। গঙ্গার বুকে ষ্টীমার চলছে সান্টিং বাজিয়ে।

পৃথিবীর আর এক আশ্চর্য, দেখতে দেখতে চলছে যেন বিশাখা। আবেগ আব আগ্রহে দ্রুত পা চালিয়েছে। প্রদর্শনীব দুয়োর বন্ধ হয়ে যায় যদি! কোন' দিকে দৃকপাত নেই। মর্মরমূর্তি, হঠাৎ যেন সচল হয়েছে। চৌরঙ্গীর আলো-আঁধারে বিশাখাকে দেখায় যেন এক বিদেশিনী। গাউনের পরিবর্তে শুধু যা শাড়ী পরিধানে।

—বিশাখা, আমি বাইরে আছি। চৌধুবী কথা বললে পাশ থেকে। হুইস্কির প্রভাবে কিনা কে জানে, চৌধুরীর কণ্ঠস্বর কেমন ভারী আর গম্ভীর। বললে,—আমি আছি এখানে। তুমি দেখে এসো। ঠাণ্ডা হাওয়া, বেশ লাগছে আমার।

সত্যিই বাতাস চলেছে শীত শীত। হিম ঝরছে পৌষালী আকাশ থেকে। চৌধুরী পকেট থেকে সিগারেট কেস আর লাইটার বের ক'রলো। যেন দুটি বরফের টুকরো; এমনই ঠাণ্ডা।

—একটু দেরী হবে আমার। কেমন যেন ভীরু কণ্ঠ বিশাখার।

মিহিস্থর। বললে,—অনেক ছবি একজিবিশনে, দেখতে সময় নেবে। তবে আপনার যদি তেমন তাড়া থাকে আপনি তো যেতে পারেন। মিথ্যে এখানে আর অপেক্ষা কেন?

অপ্রস্তুত হাসি হাসলো চৌধুরী। সিগারেটে আগুন ধরিয়ে বললে,—না আমার হাতে সময় আছে। তোমার অপেক্ষায় থাকব আমি।

—অনেক ধন্যবাদ।

দু'টি মাত্র কথা। সহাস্যে বললে বিশাখা। মুখভাবে ঈষৎ কৃতজ্ঞতা ফুটলো যেন। গোড়ালী-উঁচু জুতোর খুট খুট শব্দ তুলে বিশাখা সিঁড়ি ধরলো যাদুঘরের। দর্শকদের মাঝে হারিয়ে গেল দেখতে দেখতে। এখনও টিকিট কাটতে হবে। ছাপানো ক্যাটা-লোগ কিনতে হবে। শত শত ছবির প্রত্যেকটিতে অন্ততঃ একটিবার চোখের দৃষ্টি বুলাতে হবে। মডেলিং, উড-কাট না দেখলেও চলতে পারে। কিন্তু জল আর তেলরঙের ছবিগুলি বাদ দিলে চলবে না। এই শ্রেণীতে আছে অমলেশের খান কয়েক ছবি। লাইফ ষ্টাডি আর ল্যাণ্ড্স্কেপ্।

অফুরন্ত আলো প্রদর্শনীতে। রঙের খেলায় যেন এক স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে বিখ্যাতদের ছবির সঞ্চয়। অবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, হেমেন মজুমদার, রমেন চক্রবর্তীর হাতে-আঁকে ছবি, সযত্নে সাজানো। একরাশ হারানো রত্ন, হঠাৎ যেন নজরে পড়লো। বিশাখার পলকহীন চোখে বিস্ময় আর আনন্দ নেচে [illegible]লো। সারা ভারত থেকে শিল্পীরা ছবি পাঠিয়েছেন এই প্রদর্শনীতে। [illegible]পদ্ধতির রীতি-নীতি টেকনিক এত শত বোঝে না বিশাখা। [illegible] শুধু জানে ছবি দেখতে। ছবির বিষয়বস্তু দেখতে। রঙ আর রেখা[illegible] ব্যবহার বোঝে না বিশাখা। জানে না ছবি আঁকতে কি কি

নিয়ম পালন করতে হয়। জানে না, কোন্ তুলি কোথায় আর কখন চালাতে হবে।

সেকেলে ষ্টাইলের ছবির মাঝে মাঝে একেবারে হাল আমলের মডার্ন আর্টের একেকটি নমুনা ঝুলছে। অনভ্যস্ত চোখ, কিছুই হয়তো বুঝতে পারবে না। কিন্তু বিশাখা চেনে আধুনিক শিল্পের পরিচয়। মাতিশ, পিকাশো আর ড্যালীর প্রভাব পড়েছে কোন্ কোন্ ছবিতে।

ঐ তো রয়েছে অমলেশের হাতে-আঁকা ছবি। এক লহমায় দেখেই চিনতে পেরেছে বিশাখা। বহুবার দেখা তার, তবুও আজ চোখে পড়তেই বক্ষদেশ কেঁপে উঠলো থরথরিয়ে। কেমন এক বেদনার জ্বালা ধরছে বুকের ভেতর। অমলেশ আজ আর নেই, তার হাতে-আঁকা ছবি রয়েছে। কে বলেছে, আর্টের মৃত্যু হয়! কে বলেছে, শিল্পের স্থায়ীত্ব নেই!

চৌধুরী তখনও পায়চারী করছে সান-বাঁধানো প্রশস্ত ফুটপথে। একবার উত্তর থেকে দক্ষিণে যায়। আবার আসে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। পর পর কয়েকটা সিগারেট শেষ হয়ে গেল। হুইস্কির মৃদুমন্দ নেশায় চৌধুরীর দুই চোখের প্রান্ত লাল হয়ে উঠেছে। পৌষের রাতেও কপালে ঘাম ফুটছে। পকেট থেকে রুমাল টেনে নেয় চৌধুরী। মুখখানা মুছে নেয় সজোরে।

কত কে যায় আসে, বিশাখার দেখা পাওয়া যায় না শুধু। মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে চৌধুরী। নিজের ঠোঁট কামড়ায়। যাদুঘরের ফটকে দৃষ্টি রেখে পায়চারী করে। মুখে একরাশ বির[illegible]ণ ফুটেছে। ফিতা-বাঁধা অক্সফোর্ড জুতার মচমচানি ক্রমেই স[illegible]বর হতে থাকে।

এখনই গিয়ে বিশাখার দুই গালে ঠাস ঠাস চড়িয়ে দিতে পাখার।

হয়তো খুশী হয় চৌধুরী। অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচার কেমন বরদাস্ত করতে পারে না চৌধুরী। মেয়েজাতের স্বাধীনতা—মনে মনে হেসে ফেললো চৌধুরী। তাচ্ছিল্যের হাসি। চৌধুরীর ধারণা, মেয়েরা জন্মমূর্খ। ব্যক্তিসত্তা নেই বললেই হয় মেয়েদের। তাঁবে থাকতে চায় তাই। লতার মত জড়াতে চায়।

নৌকা, যে যেমন চালায়। কিম্বা জলের গতি যেমন, নৌকা তেমন ভেসে চলে হয়তো।

চৌধুরীর পেশীবহুল হাতের মুঠো শক্ত হয়ে ওঠে। প্রতিহিংসায় জ্বলতে থাকে সে যেন। সমগ্র মেয়েজাতের প্রতি তার রাগ আর বিদ্বেষ। এ এক ধরনের ব্যাধি কি না কে জানে। অসহানুভূতি, মনের এক রোগ বিশেষ।

ছুটন্ত গাড়ীগুলো তীরের বেগে যাওয়া আসা করছে। টেল্-লাইটের লাল রঙের বিন্দু, দপদপ জ্বলতে জ্বলতে অদৃশ্য হয়ে যায় বাঁকের মুখে। গাড়ীর পথচলা ট্রাফিক সিগনালের আয়ত্তে অধীন। পুলিস কনষ্টেবল এখানে সেখানে লুকিয়ে আছে। পথচলার নিয়ম কে মানলো, চুরিয়ে দেখছে তারা।

সিগনাল জ্বলছে তিন রঙে। লাল, হলুদ আর সবুজ। থামো, প্রস্তুত হও, যাও।

চৌধুরী ভাবছিল, মেয়েদের চালনার জন্য চাই এই ধরনের ট্রাফিক সিগনাল। রাশ আলগা করলেই মেয়েরা নাকি নাগালের বাইরে চলে যায়। কণ্ট্রোল করতে হয়। কড়া শাসনের আওতায় [illegible] হয়। মনে মনে হাসলো চৌধুরী। গোলাপ গাছকে ম[illegible]শেলে ছেঁটে দিতে হয় কাঁচি চালিয়ে। বুনো ওলের জন্য [illegible]াই [illegible]ঘা তেঁতুল।

[illegible] হি[illegible] ঝরছে বরফ-ঠাণ্ডা। ময়দানের বুক থেকে, ভিজে ঘাসের

বন থেকে, হিমবাহী হাওয়া আসছে এলোমেলো। চৌধুরী তার ট্রাইপড্‌ ব্লেজারের কলার তুলে দেয় কান পর্যন্ত। সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখে দুই হাত প্যান্টের পকেটে ভ'রে দেয়।

ইডেন গার্ডেনের লাগোয়া ষ্টেডিয়ামে কাতারে কাতারে মানুষ। খোলা হাওয়ায় নাচ গানের প্রোগ্রাম চলছে। রাশিয়া থেকে এসেছে গাইয়ে নাচিয়ে দল। সাংস্কৃতিক মিশনের সঙ্গে এসেছে।

নাচের বাজনা ভেসে আসছে ষ্টেডিয়াম থেকে। ড্রাম পিটছে হয়তো নাচের তালে তালে। অর্কেষ্ট্রায় রাশিয়ার জাতীয় সঙ্গীতের সুর খেলছে। পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ণের বিশাল সুমিষ্ট আওয়াজ আসছে অনেক দূর থেকে।

—ননসেন্স! অস্বাভাবিক বিরক্তির সঙ্গে আপন মনে বলে ফেলে চৌধুরী। এক নাগাড়ে পায়চারী ক'রে বিব্রত হয়ে ওঠে। অপেক্ষার সীমা আছে একটা। কাঁহাতক আর ঘোরাফেরা করা যায় একা একা। পথের পথিক সন্দেহের চোখে দেখে। ইঙ্গ-বঙ্গ কুমারী যুবতী সসাবধানে এড়িয়ে চলে পাশ কাটিয়ে। চৌধুরী আরও যেন উগ্র হয়ে পড়ে। তার ইচ্ছা হয়, আর নয় প্রতীক্ষা। যা মন চায় করুক বিশাখা। যাক্‌, যেখানে খুশী। চৌধুরী ফিরে যেতে চায় নিজের ডেরায়। হাত-ঘড়ি দেখে ঘন ঘন। আর মাত্র পাঁচ মিনিট দেখবে। তারপরেও যদি বিশাখার দেখা না পাওয়া যায়, চৌধুরী নিশ্চয়ই একখানা ট্যাক্সি ডেকে কেটে পড়বে।

—ক্ষমা করুন মিষ্টার চৌধুরী।

পিছন থেকে মধুকণ্ঠী বিশাখা কথা বললে। মুখোমুখি

হাসি মাখিয়ে বললে,—দেরী হয়ে গেল। কিছু মনে করবেন না। একজিবিশনে অমলেশের ক'জন শিল্পী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। কথা বলতে বলতে—

চৌধুরী ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললে,—বিবেচনা কথাটা তোমার অভিধানে নেই। আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষার পর আমি চ'লে যাবো স্থির ক'রেছিলাম।

—আমার সঙ্গে গেলেই পারতেন। বিশাখা হেসে হেসে বললে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করলো কথার শেষে। ঘাম ঘাম মুখ মুছলো চেপে চেপে। প্রদর্শনীতে অনেক জোরালো আলোব উত্তাপে বিশাখা ঘেমে উঠেছে।

চৌধুরী একটা তাজা সিগাবেট ধবালো আবার। লাইটার পকেটে বাখতে রাখতে বললে,—আমি কিছু বুঝি না ছবির। আর্ট আমার কাছে অপ্রয়োজনের। কোন মূল্য দিই না আমি।

—শিশুরাও ছবি দেখলে বুঝতে পারে। অজ্ঞ গ্রামীনও চালা-ঘবের দুয়োবে দেওয়ালে ছবি আঁকে। রেখা আর বঙের কদর সকল দেশেই আছে। বিশাখা বললে চলতে চলতে। তাব মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেছে কখন। কথা বলছে কেমন বেসুরো। অন্যমনে।

—তা হোক ; আমি ছবি আঁকাব কাজকে অলসের কর্ম বলি। [illegible]থ্যে সময়েব অপচয় হয়। ল্যাবরেটরী আর ষ্টুডিওতে আমার ছ [illegible]ন জমিন ফারাক ঠেকে। চৌধুবী বললে দন্তেব সুবে। [illegible]্যয়ের ভঙ্গীতে।

ম[illegible] কথা বাড়ে। বিশাখার মন এখন ভরে আছে শিল্প-চাই[illegible] সম্মোহনে। নিশ্চুপ থাকতে ইচ্ছা হয়। রঙেব বিন্যাস [illegible] দু'টিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। একেকটি ছবির বিষয়-

বস্তু, মনে পড়ছে থেকে থেকে। শিল্পীব কল্পনার সঙ্গে যেন বিশাখার চিন্তাধারা এক হয়ে গেছে।

কথা বলতে মন চায় না, তবুও বলতে হয়। বেশ খানিক নীরব থেকে বিশাখা বললে,—আর্টের আলোচনা স্থগিত থাক মিষ্টার চৌধুরী। আপাততঃ ইতি দিন।

কি বলতে গিয়ে থেমে যায় চৌধুবী। মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। চৌধুরী একবার অপাঙ্গে লক্ষ্য করে সহযাত্রিনীর মুখভাব। দেখতে পায়, সেই অসাধারণ গম্ভীর। বিশাখার চোখের চাউনি যেন কেমন তবো। তরোয়ালের মত সূক্ষ্ম দুই ভুরু আরও যেন বেঁকে উঠেছে। বিশাখা চলছে ক্লান্ত পদক্ষেপে। সে যেন ভুলে গেছে, আরও একজন আছে তাব সঙ্গে। তার সহযাত্রী আছে।

—একটা হোটেলে খানিক বসা যাক্। কি বল’?

চৌধুরী প্রশ্ন কবলে কথার সুর পালটে। মুখে হাসি মাখিয়ে। কত যেন ঘনিষ্ঠ এমনি কথার ধরন।

—না, হোটেলে গিয়ে উঠতে এখন আর মন চাইছে না। বিশাখা বললে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। বললে,—আপনি যেতে পারেন, সাধ যদি থাকে। আমি ফিরে যাই।

—তাই কি হয়! তাই কি হয়! চৌধুরী বললে কেমন যেন অন্তরঙ্গতার সঙ্গে। বিশাখার কাছাকাছি স’রে যায় কথা বলতে বলতে। বিশাখার একখানি হাত নিজের হাতে ধরতে চেষ্টা করে হাত ছাড়িয়ে নেয় বিশাখা, কি এক আক্ষেপে। চৌধুর[illegible] আবার বললে,—হোটেলে কিছু খেয়ে নিয়ে চল’ একটা সিনে[illegible] যাক নাইট শোয়ে।

—না। আপনি যেতে পারেন। আমি ফিরে যাই। [illegible] কণ্ঠস্বর নির্লিপ্ত। কথায় বীতরাগের সুর। [illegible]লে

—হার্টলেশ তুমি। বললে চৌধুরী। অভিযোগ জানায় ফিসফিস। বলে,—হৃদয়হীন। দয়া মায়া বলতে কিছুই নেই তোমার।

হেসে ফেললো বিশাখা। বললে,—এখানেই আপনার সঙ্গে আমার অদ্ভুত মিল।

চৌধুরীর মুখে ক্রুর হাসির ঝিলিক খেলে। কৃত্রিম হাসি হাসতে হয় তাকে। বিষয় হালকা হয় যাতে তাই হেসে হেসে কথা বলে চৌধুরী। বললে,—আমি কি এতই নির্দয় নিষ্করুণ?

কি জানি কি। বললে বিশাখা, আঁধার-ঢাকা ময়দানের দিকে তাকিয়ে। ম্লান হাসি ফুটলো তার মুখে। খানিক থেমে বললে,—ফাঁকা মাঠে কিছুক্ষণ বসতে পারি, যদি বলেন। হোটেল, সিনেমাব ভীড় অসহ্য লাগছে আমাব। কিছু মনে করবেন না।

—তথাস্তু। চৌধুরী কথা বলতে বলতে ফুটপথ থেকে রাস্তায় নামলো। প্রশস্ত পিচঢালা রাস্তায় আলোর স্পর্শ চাকচিক্য তুলছে ক্ষণে ক্ষণে। ময়দানের শেষসীমা থেকে ভেসে আসছে শীত শীত হাওয়া। নাচের বাজনার তাল আব ঝঙ্কার।

বিশাখার শুভ্র নরম হাত একখানি নিজের হাতে তুলে নেয় চৌধুবী। এবাব আর বাধা দেয় না বিশাখা। আপত্তি জানায না। রাস্তা পেরিয়ে যায় দ্রুত পায়ে। বিদ্যুতের বেগে সাবি সাবি মোটর ছুটছে এদিক থেকে সেদিকে। সরকারী পরিবহন ডবল-ডেকার আসছে মত্ত হাতীব মত ছুটতে ছুটতে। বাসের গুরুগর্জনে ...ই চৌরঙ্গী বোড।

ম. ...াৎ তুলনা আব তফাত ধরা পড়লো বিশাখার অবচেতনে। চাই ...আব চৌধুবীতে কত যে পার্থক্য! অমলেশ জানতো না, ...রস্কার নিয়ন্ত্রণ। খাঁচায় বন্দী নয়, পাখী মুক্ত হোক, এই

ছিল অমলেশের মনের ভাব। চৌধুরীর ঠিক বিপরীত। কথায় কথায় কড়া সুর কোনদিন অমলেশের মুখ থেকে শোনা গেল না। চৌধুরীর মেজাজ কখন যে সপ্তমে চড়বে, বলা যায় না। অমলেশ স্থিরধীর, চৌধুরী যেন মূর্তিমান প্রতিবাদ। মতের বিরুদ্ধে গেলেই চৌধুরী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নিজের মতামত অন্যের স্কন্ধে চাপানো অমলেশের স্বভাবে কোনদিন ধরা পড়লো না। অথচ চৌধুরীর কাছে নিজের মতই প্রধান।

জুতার তলায় হিমার্ত ঘাম। ভিজে ঘাসের পরশ লাগে বিশাখার পায়ে। দুই পায়ে কচিঘাস দলতে কেমন মায়া হয় বিশাখার। মনে হয়, প্রকৃতিকে পদাঘাত করছে যেন এক এক পদক্ষেপে। গড়ের মাঠের পায়ে চলা সঙ্কীর্ণ পথগুলি রাতের অন্ধকারে যেন হারিয়ে গেছে।

—কোথায় চললে এমন হনহনিয়ে? মুখে সিগারেট ঝুলিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে শুধোয় চৌধুরী। কথার সুর যেন সরগরম।

—ঐ যে আলো জ্বলছে, জানালার কাচে রঙীন ছবি ফুটেছে। ঐ দিকেই চলেছি আমি। দেখবো কি আছে ঐ ছবির মত ক্যাশেল্‌টায়। কথা বলতে বলতে পরম কৌতূহলের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে বিশাখা। মরুমাঝে যেন মরুদ্যান দেখতে পেয়েছ সে। নয়তো সীমাহীন সমুদ্রে দেখতে পেয়েছে এক খণ্ডভূমি।

ফাঁকা মাঠের বুকে ছবির মত একখানি ইমারত।

যেন পটে আঁকা-ছবি। কালো রাত্রির ক্যানভাসে।

স্বপ্নসৌধের মতই দেখায় দূর থেকে। নিরবিচ্ছিন্ন শা[illegible] হয়তো ঐ শান্তিনিকুঞ্জে। জানলায় রঙীন কাচে ছ[illegible] হরেকরকম।

মাছের চোখ দেখছে যেন বিশাখা, মহাভারতের অর্জুন[illegible]

আর কিছু নজরে পড়ছে না। শুধু ঐ রঙীন ছবি দেখছে এক-লক্ষ্যে। রঙের সমন্বয় দেখছে সাগ্রহে। নানা রঙের কাচের টুকরো জুড়ে জুড়ে চিত্ররূপের সৃষ্টি হয়েছে অভিনব।

- ছবিতে বিশাখা দেখতে পায়, কার বিশাল বক্ষ থেকে তাজা লাল রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছে। বুকের ঠিক মধ্যস্থলে ক্ষতচিহ্ন। অবিরাম রক্ত পড়ছে টুপ টুপ। কিন্তু কৈ মুখে তো বেদনার আভাষ নেই! মুখখানি সৌম্যসুন্দর! দীর্ঘ চোখের আঁখি তারকা তাকিয়ে আছে ঊর্ধ্বপানে। মহাকাশে নিবদ্ধ চাউনি। আহত জনের দুই হাত থেকে রক্ত ঝরছে বিন্দু বিন্দু। রক্তাক্ত দুই পা।

—ওটা তো একটা চার্চ। পিছন থেকে কথা বললে চৌধুরী। বিশাখার পিঠে হাত রেখে। বললে,—চার্চে গিয়ে কি হবে?

—আমি দেখবো। বিশাখা বললে অদম্য উৎসাহে। বললে, —বাইরে থেকে দেখব ভেতরে কি আছে, কে আছে।

—তার চেয়ে এসো এই বেঞ্চে বসি আমরা। চৌধুরী পালটা প্রস্তাব ক'রলো। কিছু বা বিরক্তির সুরে। বললে,—চার্চে যাবে কেন এমন অসময়ে!

—মন্দিরে যাওয়ার আবার সময় থাকে না কি? যে যখন খুশী যেতে পারে। বিশাখা কথা বলছে আনমনে। সে তখন মুগ্ধচোখে দেখছে, অন্ধকার পটভূমিকায় রঙীন আলোর ছবি! বললে,— আমি কাছে গিয়ে দেখবো ঐ ছবি।

—আচ্ছা ফ্যাসাদ বটে! অধৈর্য প্রকাশ পায় চৌধুরীর নিরাশার সুর। বলে,—বিশাখা, যেও না।

ম. ভোর বিশাখা! তার কানে যায় না কোন কথা! যন্ত্র-

চাই মত এগিয়ে চলেছে সে! নিশির ডাক শুনেছে যেন! যুক্তি মানতে চাইছে না। নিষেধ কানে তুলছে না।

চার্চ-ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে পড়লো বিশাখা। বাইরে থেকে সাগ্রহে লক্ষ্য করে, চার্চে তখন মানুষ নেই। আরাধনার মন্ত্র নেই। দেখা যায়, অলটারের সামনে বাতি জ্বলছে। বেদীমূলে ফুলের স্তবক। একজোড়া পিয়ানো। কান পাতলে হয়তো এখনও সান্ধ্য-উপাসনার সুরগুঞ্জন শোনা যাবে। প্রার্থনা সঙ্গীতের অস্ফুট ধ্বনি ভেসে ভেসে বেড়ায় চার্চ-হলে। পিয়ানোর ঠুং ঠুং রণরনিয়ে ওঠে।

কি জানি রাত্রি এখন কত! হঠাৎ চার্চের চূড়ায় ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। সময়-সঙ্কেত জানানো হয় প্রতি এক ঘণ্টায়। ঢং ঢং শব্দ আকাশপানে ছুটতে থাকে। চৌরঙ্গী রোডে ছড়িয়ে পড়ে ঘণ্টার আওয়াজ।

সময় পেরিয়ে চলেছে, সময় এগিয়ে চলেছে, তারই শব্দ-ইঙ্গিত শুনিয়ে দেওয়া হয় যেন। জানিয়ে দেওয়া হয় কালের পদধ্বনি।

মানুষের কানে কানে শোনানো হয়, সময় এগিয়ে আসছে। সেই পরমের সঙ্গে মিলনের মধু মুহূর্ত নিকটে আসছে। ঘনিয়ে আসছে শেষ বিচারের ক্ষণ।

পাশে এসে দাঁড়ায় চৌধুরী। এতই আত্মমগ্ন যে বিশাখা চমকে ওঠে প্রায়।

একেই চার্চ-ফটকের দুই পাশের আলো কুয়াসায় অস্পষ্ট হয়ে আছে। হিম পড়েছে ঘষাকাচে। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে যে আলোর ছাউনিতে। অন্ধকার বেশ ঘন হয়েছে ময়দা[illegible] জু[illegible] পিচঢালা রাস্তার আলোগুলি জ্বলছে দূরে দূরে। কুয়াসায়[illegible] বিস্তার নেই তেমন যেন।

বিশাখার একখানি হাত চৌধুরী নিজের হাতে ভ[illegible] যেন এক খণ্ড বরফ, এমনই ঠাণ্ডা। চৌধুরী কাঁধের [illegible]লে

এগিয়ে আসে। বিশাখার কানের কাছে ঠিক। বলে,—চল' এখান থেকে যাওয়া যাক।

হঠাৎ এক ঝলক কাতর হাসি হাসলো বিশাখা। কেমন যেন ব্যথাতুর কণ্ঠে কথা বললে। বলে,—জানো, উনি এই নিদারুণ কষ্টের জ্বালায় কি বলেছিলেন ?

—উঁহু, না। জানি না। চৌধুরী কথা বলে বিশাখার হাতে সামান্য করপীড়নের সঙ্গে। কখন চৌধুরী একবারে কাছাকাছি এগিয়ে গেছে। বিশাখার ঠিক পাশটিতে।

—তা আর জানো না! তুমি জানো লোহা-লক্কড়, বালি-সিমেণ্ট, ইঞ্চি আর স্কোয়ার ফুট। তুমি জানো শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং। ব্যস, আর কিছু নয়। বিশাখা এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি ব'লে যায়।

হো হো হেসে উঠলো চৌধুরী। হাসি যেন সম্মতির লক্ষণ। মেনে নেয় চৌধুরী, বিশাখার বিশ্লেষণ। হাসি থামিয়ে বলে,—কি ব'লেছিলেন তাই শুনি ?'

উঁচু এক জানলায় রঙীন কাচের ছবিতে চোখ মেলে আছে বিশাখা। ছবি দেখছে, না রঙ দেখছে কে জানে। ছবিতে এক আহতজনেব বেদনাকাতর মূর্তি। হাত পা আর বুক থেকে টক-টকে লাল বক্ত ঝরছে। মাথায় কাঁটার মুকুট।

বিশাখার কথা কেমন কাঁপা কাঁপা। বললে,—তাঁকে যখন শ বিদ্ধ করছে তখন তিনি বলেছিলেন, 'ঈশ্বর এরা জানে না। 'অে আমার হত্যাকারীদেব তুমি ক্ষমা কর'।'

.।নের শেষ থেকে, ফোর্ট উইলিয়মের র‍্যামপার্ট থেকে ঠাণ্ডা ম. াত সের ঢেউ আসছে একটা একটা। ভিজে ঘাস থেকে চাই াছে হিমবাহী হাওয়া।

' এখন যাওয়া যাক এখান থেকে। চৌধুরীর সুরে

বিরক্তি। বিশাখার কটিদেশ জড়িয়ে ধ'রেছে চৌধুরী। ব্লেজারের কলার উলটে দিয়েছে আকান।

—হ্যাঁ যাবো চল'। বিশাখা বললে ফিসফিস। তাকিয়ে থাকলো মুগ্ধ চোখে। রঙ দেখছে না রেখা দেখছে কে জানে। ছবির বিষয় দেখছে না রঙীন কাচের বাহার দেখছে বিশাখাই জানে। পলক পড়ছে না চোখের। শুভ্র বেশধারিণী বিশাখাকে দেখায় যেন সাধিকার মত।

চার্চ-ফটকের দুই পাশে ঘষা কাচের আলোর সেডে হিম ঝরেছে। চোখের জলের ধারা নেমেছে যেন।

অনিচ্ছায় পা চালায় বিশাখা। নেহাৎ একজন পাশে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন তাড়া দিয়ে চলেছে। চলতে চলতে পিছু ফিরে তাকায়। ফেলে যাওয়া ছবিখানি দেখে বার বার। ফিরে ফিরে তাকায়।

বিশাখার কটিতে চৌধুরীর বাহু বেষ্টন। চৌধুরী যেন তা'কে টেনে নিয়ে চলেছে।

একবার ইচ্ছা হয়, একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয় চৌধুরীকে। বিশাখার ভাল লাগছে না এই দেহস্পর্শ। চৌধুরীর হাতের থাবা বিশাখার কোমর থেকে ওপর দিকে অগ্রসর হ'তে চায়। ম্যাগনেটের টান- যেন চৌধুরীর বাহুবন্ধনে। দুর্নিবার আকর্ষণ। তবুও যদি বাধা দিতো বিশাখা। সে যেন এখন অন্য দুনিয়ায়। তার আত্মজ্ঞান হারিয়ে গেছে। তার চোখে ঐ রঙীন কাচে ছবি। বিদ্ধস্থান থেকে, যীশুর বুকের ক্ষতচিহ্ন থেকে রক্ত ঝরছে। যীশুর মাথায় কাঁটার লরেল।

কেমন যেন আনমনা বিশাখা। অন্য এক পৃথিবীতে সে। নেই, কে তাকে ছুঁয়েছে। দেহ-সচেতনতা হারিয়ে গেছে এক ছবি দেখে। বিশাখার মনের খেয়ানে ঐ ছবি এখন ভেসে

সাঁই সাঁই মোটর ছুটেছে চৌরঙ্গী রোডে।

উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটছে। দক্ষিণ থেকে আসছে উত্তরে। রাজপথের দুই পাশে যতদূর চোখ যায় শুধু লাল টেল-লাইট মোটরের। আলোর লাল বিন্দু ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে যায়। যত সব হোমড়াচোমড়াদেব মোটর চলেছে হোটেলমুখো। ডিনারেব টাইম ঘনিয়ে এসেছে।

হোটেলে হোটেলে ডিনার বেল বাজতে শুরু হয়েছে হয়তো।

যতেক কেউকেটা আর দূত-অফিসের ভিনদেশীরা পার্টিতে চলেছে। নাচ গান বাজনা পান ভোজন। এমব্যাসির গাড়ীতে পতাকা উড়ছে। আমেরিকান, ব্রিটিশ, রাশিয়ান নিশান উড়ছে।

—শীত করছে তোমাব? চৌধুবী বললে মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে। ফাঁকা মাঠ, তাই আর চুপিচুপি কথা নয়। চৌধুরীর কণ্ঠ একেই স্বভাবগম্ভীব।

ম্লান হাসি বিশাখাব মুখে। আঁধার কালিমায় দেখতে পায় না চৌধুরী। চোখ দুটি যেন সজল! বললে,—না, আপদেই নয়। বরং আগুন জ্বলছে মাথায়। মাথা ধ'বে গেছে। আমাকে একখানা ট্যাক্সি ধরিয়ে দাও। প্লীজ।

—না না। এখনই নয়। চল' আমরা হোটেলে গিয়ে উঠি। ানিক আরও—

চৌধুরীব কথা শেষ হ'তে দেয় না বিশাখা। মুখের কথা কেড়ে —মাপ কবতে হচ্ছে স্যার। লেট মি কুইট। আমাকে ও।

ম. ক্ষণও নয়। চৌধুরী বললে ভারী গলায়। বললে,— চাই তামাকে এখন ছাড়ছি না।

হি ফেললো বিশাখা। বললে,—খানিক বাদে তবে ছাড়ছেন?

—হ্যাঁ। সিওর। ইয়েস। চৌধুরী পর পর তিনটে শব্দ উচ্চারণ করলো।

ঠাণ্ডা বাতাসের ঢেউ এসে বিশাখার রুক্ষ চুলের বোটায় ঝড় তুলছে। কপালের পরে কয়েকটা কুন্তল নেচে নেচে উঠছে উত্তর বাতাসে। হিমালয়নির্ঝর, তাই বরফ ঠাণ্ডা।

এসপ্লানেডের শীর্ষভাগে আবার সেই রঙীন আলোক রেখা। রাস্তায় নামলো বিশাখা। বিজ্ঞাপনের মোহ ছড়ানো দূরের কালো আকাশে। মুঠো মুঠো রঙ অসংযত। এখানে সেখানে ছড়ানো। খাপছাড়া। নিওন আলোর টিউব জ্বলছে। আলোর রেখায় লেখা নাম আর গুনগান। ছায়াছবির বিজ্ঞপ্তি। তারকার নাম জ্বলছে দূরান্তে। পণ্যের নাম ভাসছে। কোম্পানীর শিরোনামা জ্বলছে। ক্যাপিটাল পুড়ছে খরচখাতায়। অ্যাডভার-টাইসমেন্ট খাতে খরচ পড়ছে মোটা অঙ্ক। প্রচারে ব্যয়।

কমার্শিয়াল আর্ট। আকাশে উঠেছে। মনে মনে হাসলো বিশাখা। টাকার অভাবে শিল্পীদের মাথা বিগড়ে যাওয়ার পর ফাইন আর্টের দিকে নাকি তারা ঝুঁকে পড়ে। এটা বিশাখার ধারণা নয়, তার শোনা কথা। কতদিন হাসতে হাসতে অমলেশ এই মন্তব্য ক'রেছে কাগজে প্রেস ক্যাম্পেন্ দেখতে দেখতে। অমলেশ আরও ব'লতো কাঁচি আর আটা থাকলেই কমার্শিয়াল আর্টে কাজ চলে। সেুফ্ পেষ্টিং।

—ট্যাক্সি মিলবে না নাকি? ইদিক সিদিক দেখ[illegible]

কথা বলে বিশাখা। স্বগতউক্তি করে যেন।

—না মিলবে না। চৌধুরী রুক্ষ সুরে কথা বললে। [illegible]

ফুটে বিজলী আলো। তাই ছাড়াছাড়ি চলছে চৌধুরী

ঘেঁষছে না। [illegible]লে

ফিরপো হোটেলের দোতলায় অর্কেষ্ট্রা বেজে চলেছে। বেয়ালার টানা টানা সুর ভেসে আসছে। পিয়ানোর গমক।

—তোমাকে আমি যেতে দেবো না এখন। আবার বললে নাছোড় চৌধুরী। নিজের ঠোঁট কামড়ে ধ'রে বললে,—চল' কোথাও বসা যাক্ আরও কিছুক্ষণ।

বাধ্যবাধকতা পছন্দ করে না বিশাখা। বাধা আর শাসনকে ঘৃণা করে। তর্জনগর্জন শুনলে বিশাখাও বেয়াড়া হয়ে ওঠে আরও।

কৈ, অমলেশ কোনদিনের তরে শাসনের সুরে একটা কথা বলেনি কখনও। হুকুমেব হুমকি শোনায়নি একদিনও।

—পিসীমা কত ভাবছেন হয়তো। আপন মনে বললে বিশাখা। সত্যিই তার মুখে কপালে চিন্তার রেখা ফুটলো যেন। লীলাবতী পিসীমা হয়তো জেগে ব'সে থাকবেন, বিশাখা যতক্ষণ না ফিরে যায়। বিশাখা হাতঘড়ি দেখলো চোখের কাছে তুলে। বললে,—ট্যাক্সি এমন বিরল কেন আজ? আমার বিরুদ্ধে একি ষড়যন্ত্র ট্যাক্সি অ্যাসোশিয়েশনের?

পথ চলতে চলতে চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে থাকে বিশাখা। হলুদ-কালো রঙের ট্যাক্সি যদি একখানা দেখতে পাওয়া যায়। তাও শূন্য হওয়া চাই। যাত্রী বোঝাই নয়।

—ব্রিষ্টলে যাবে? সেপারেট্ কামরা পাওয়া যেতে পারে। ধরী[illegible]লে নিরুপায়েব মত। বললে,—আর এক রাউণ্ড্ কফি [illegible]ৎ।স্ক তোমার আমার? কিম্বা কোন সিনেমায় নাইট শো?

ম[illegible] —[illegible]র্জনা করতে হচ্ছে। বিশাখা হেসে হেসে বলে। বললে,— চাই [illegible] মাথায় আগুন জ্বলছে। কফি খেয়ে ঘুমের ব্যাঘাত হোক [illegible]ই।

—তবে কাল আসছো আবার? অগত্যা বললে চৌধুরী। বললে,—কোথায় কাল মীট্ করছি? মেট্রোর সামনে? নিউ মার্কেটের মেইন গেটে? এসপ্লানেডের ট্রাম টারমিনাসে?

—টারমিনাসে দাঁড়িয়ে ট্রামচাপা পড়তে চান না কি। হাসির ঝলক তোলে বিশাখা, কথার সুরে। বলে—কলকাতা থেকে বের ক'রে দেয় শুনেছি, ট্রামে চাপা পড়লে?

—না না। বললে চৌধুরী। বিজ্ঞজনের মত বললে,—ভুল বললে তুমি। গো-শকটে চাপা পড়লে এই শাস্তি।

খিল খিল হেসে উঠলো বিশাখা। সশব্দ হাসিতে পাশের একজন চলন্ত ভদ্রলোক ফিরে তাকালেন।

—কাল আসবে না? চৌধুরী শুধোয় আবার। লোভের দৃষ্টি প্রকট তার চোখে। অনেক আলোয়, স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে বিশাখাকে, এতক্ষণে। চৌধুরী দেখছে, বিশাখার দেহলাবণ্য। কি উগ্র যৌবন! অফুরন্ত যেন।

—না আসতে পারবো না। বিশাখা জবাব দেয়। তেমনি সন্ধানী চোখে ট্যাক্সি খুঁজতে খুঁজতে। সমুখ পিছু দেখে বার বার। একখানা শূন্য ট্যাক্সি চাই।

হোটেলের দ্বারে দ্বারে গাড়ী এসে দাঁড়ায়। গাড়ীর গর্ভ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় জোড়া জোড়া বৈধ আর অবৈধ, আসল আর নকল স্বামীস্ত্রীদের। ময়দানের কিনারায় সারি সারি গাড়ী পার্ক ক'রেছে। ড্রাইভারের দল, আড্ডা জমিয়েছে।

—রাজরাণী হবে মা।

কার কথা শুনে শিউরে ওঠে বিশাখা। আচমকা অশনি বর্ষায় কোথা থেকে কে। তাই বল', একদল ভিখারী। দ একটি নিরন্ন পরিবার। বেরীবেরীতে দৃষ্টি হারিয়েছে স্বামী, লে

লোকটির হাত ধ'রে আছে একটি কিশোর ছেলে। মায়ের বুকে সবশেষ সন্তান। পৌষ-শীতে কাঁপছে ঠক ঠক। একখানা শতচ্ছিন্ন ময়লা চাদরে শীত কাটছে না।

—কাল থেকে খাওয়া জোটাতে পারিনি মা। দু'চার আনা পয়সা যদি দেন। বুকেব সন্তান অনাহারে ধুঁকছে। কথা বললে প্রায় বিবস্ত্রা। কান্নাব সুবে বললে যেন।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলতে থাকে বিশাখা। পার্স বের করলো তাড়াতাড়ি। হাতে যা খুচবো পয়সা ওঠে দিয়ে দেয় সহানুভূতিতে।

—দিও না দিও না। বললে চৌধুবী। ব্যস্ত হয়ে উঠলো বেশ। বললে,—এখনই আবাব আসবে দলে দলে। ওরাই তাদেব পাঠিয়ে দেবে।

ট্যাক্সির পাত্তা পাওয়া যায় না। একখানা ডবলডেকাব এসে ব্রেক কষে সশব্দে। ডিজেল তেলেব পোড়াগন্ধে বাতাস যেন বিষিয়ে ওঠে। বিনা পবোয়ানায় হঠাৎ বাসে উঠে পড়লো বিশাখা। বললে,—চলি আজকের মত।

চৌধুবী তো হতবাক প্রায়। বাস ষ্টার্ট দিয়েছে। তবুও চৌধুবী বললে শেষবারেব মত। বললে,—বিশাখা, যেও না।

বাসের ইঞ্জিন গর্জে উঠলো। যেন ধমকে উঠলো চৌধুবীকে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইলো এক রাশ। ঝির ঝির হিম ঝবছে তখন চৌরঙ্গী রোডে।

ব[illegible]টলো আবার জোবালো গতিতে। কেমন যেন আচ্ছন্নেব [illegible]াসনে ,ব'সে পড়লো বিশাখা। জানালার বাইরে তাকিয়ে ম[illegible] এক বীতরাগে। আবার যদি একবাব দেখতে পাওয়া চাই [illegible]র্চের উঁচু দেওয়ালের জানালায় রঙীন কাচের ছবিখানি। [illegible]ঝরা ছবি এখনও বিশাখার মনের চোখে। বিশাখা বাইরের

অন্ধকারে খুঁজতে থাকে চার্চ-ফটক। কৈ, দেখা যায় না আর। পরমপিতা কি বার বার দেখা দেন! সেই মহান তিনি কি এতই সুলভ!

অনেক অনেক ছবি দেখেছে আজ বিশাখা। আকাদেমীর প্রদর্শনীতে সারা ভারতের সেরা শিল্পীদের চিত্রাবলী দেখেছে সে। অমলেশের আঁকা ক'খানা ছবিও আছে।

কিন্তু ঐ একখানি ছবি আজ মূর্ত হয়ে উঠেছে বার বার। বিভোর বিশাখার কানে তখনও ভাসছে চৌধুরীর শেষ কথা। বিশাখা, যেও না।

মনে মনে হাসলো বিশাখা। কত রাত এখন কে জানে! হাত-ঘড়ি দেখে বিশাখা। লীলাবতী পিসীমা ভাবছেন হয়তো। ফিরে গিয়ে তার কাছে মিথ্যা বলতে হবে। সাজিয়ে বানিয়ে যা হয় কিছু।

কি অদম্য গতিতে ছুটছে ডবলডেকার। হিমার্ত হাওয়ায় বিশাখার রুক্ষ চুল উড়ছে। শুভ্রসীঁথিতে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ লাগে। আগুন জ্বলছে যেন বিশাখার কপালে। মাথাটা ধ'রে গেছে কখন।

কেউ যদি চেনাজন থাকে সহযাত্রীদের মাঝে! বৌ মানুষ বিশাখা। পরিচিত কারও যদি নজর পড়ে! তাই ঘোমটা তুলে দেয় বিশাখা। শুভ্রসীঁথি ঢেকে দেয় আকপাল গুণ্ঠনে।

চৌরঙ্গী রোড স্যাঁৎ স্যাঁৎ করছে। হিম পড়েছে ঝির-ঝির। কুয়াসায় অস্পষ্ট পথপাশের আলো।

আবার একটা বারে ঢুকেছে চৌধুরী! দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘন ঘন।

ওয়েটার এসে দাঁড়াতেই চৌধুরী অর্ডার দেয়,—হুইস্কি।

কি বিশ্রী লাগছে বারের বাজনা! চৌধুরী বিব্রত বোধ করে। কানে যেন তার বিষ ঢালছে ওয়ালজ্‌ সুর। পিয়ানোর ঠুং ঠাং অসহ ঠেকছে।

হুইস্কির গ্লাস বসিয়ে দিয়ে যায় বেয়ারা। মুখে তুলতে যাবে; চৌধুরী দেখতে পায় গ্লাসের সোনালী জলে একখানি মুখ ভাসছে। বিশাখার সৌম্যসুন্দর মুখ।

চৌধুরী আবার একবার ফিস্‌ফিস করে। বলে,—বিশাখা, যেও না।

তীব্র গতিতে ছুটছে তখন ডবলডেকার। বিশাখা তাকিয়ে আছে বাহিরপানে। ঠাণ্ডা বাতাসে রুক্ষ চুল উড়ছে কপালে। আঁধার আকাশে সেই ছবিখানি খোঁজাখুঁজি করে বিশাখা। আর দেখতে পায় না একটিবার।

আকাশে নক্ষত্র জ্বলছে অসংখ্য। বিশাখা লক্ষ্য করে, একটি জ্বল্‌জ্বলে নক্ষত্র, তার সহগামী হয়ে চলেছে যেন সঙ্গে সঙ্গে। পলক পড়ে না চোখে। পাছে হারিয়ে যায় ঐ ক্ষুদ্র তারা। সোনালী আলোকবিন্দু।

বিশাখার চোখের তারা ছলছলিয়ে ওঠে কেন কে জানে!